প্রতিচিন্তা

মেহেরপুর সরকারি কলেজ
মেহেরপুর

প্রতিচিন্তা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর
অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

কলেজ বার্ষিকী প্রকাশনা কমিটি

আহ্বায়ক
মো: খেজমত আলি মালিথ্যা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা

সদস্য
মঈনুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা
মিলন মন্ডল, প্রভাষক, ইংরেজি
এস,এম, আশরাফুল হাবিব, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

সম্পাদক
মো: খেজমত আলি মালিথ্যা

সম্পাদকমণ্ডলী
মঈনুল ইসলাম
মিলন মন্ডল
এস.এম আশরাফুল হাবিব

অক্ষর বিন্যাস
জাহিদুল ইসলাম

প্রচ্ছদ
প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর

প্রকাশকাল
জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ / আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

মুদ্রণ
অন্বেষা কম্পিউটার্স
৩২৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা), কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৭১২-১০৫৯৬৪, ০১৫৫২-৩৫০৮১৩ (হোয়াটসআপ)

উৎসর্গ

গণঅভ্যুত্থানে সকল

শহীদ স্মরণে

সূচিপত্র

☐ বাণী

অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ ০৫
উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান ০৬
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর ০৭
অধ্যক্ষ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

☐ সম্পাদকের কথা ০৮
মো: খেজমত আলি মালিথ্যা

☐ বিশেষ প্রতিবেদন ০৯
মেহেরপুর সরকারি কলেজ : দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের
বৈদ্ধিক বিকাশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ

☐ প্রবন্ধ

পলিথিন : সুবিধার ছায়ায় লুকানো বিপদ ১২
প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : একটি পর্যালোচনা ২০
মোঃ কাউছার আলী

ব্লু-ইকোনমির বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও অগ্রগতি ২২
ড. সঞ্জয় বল

বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ২৮
এস, এম, আশরাফুল হাবিব

বেগম রোকেয়া : নারী মুক্তির অগ্রদূত ৩০
সানজিদা ফেরদৌস

মীর মশাররফ হোসেন: প্রথম মুসলিম গদ্য শিল্পী ৩৩
নিলুফার ইয়াসমিন

রবীন্দ্রনাথ : আত্মলোকের আলোকদ্রোষ্টা ৩৫
অনিক হাসান

☐ ছোটগল্প

ভালবাসার কষ্ট ৪১
মো: হাবিবুর রহমান

হাকিম ও হেকিম পাড়ার গল্প ৪৪
মঈনুল ইসলাম

জলপাই গাছের ছায়ায় ৪৭
মো: নাফিউল ইসলাম

এক বিকেলের বনোফুলেরা ৫১
মোছা: রিমিয়া খাতুন

ধোঁয়ার ভেতরে কে ছিল? ৫২
ফারদিন এহসান রিফাত

☐ নিবন্ধ

ডি ভ্যালেরা–ডাকাত থেকে বিজ্ঞানী ৫৩
মোহা: খসরু ইসলাম

যুক্তিই হোক মুক্তির পথ ৫৫
মোছা: আলেয়া খাতুন আলো

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল : সংঘাতের ইতিহাস ৫৬
ইসতিয়াক আহমেদ খাঁন

☐ ভ্রমণ কাহিনি

জাপানের পরিচ্ছন্নতা সংস্কৃতি ও আমাদের দায়বদ্ধতা ৫৯
নিগার ইসলাম

আটলান্টিকের ওপারে ৬১
মোঃ নাহিদ আনদালিব

সিঁড়ি, সাগর আর একাকীত্বের গল্প ৬৪
মো: শিহাব হাসান

☐ কবিতা

ভোর প্রকৃতির বুকে ৬৫
উলমাতুন নেছা পূর্ণিমা

জ্ঞানের দীঘি ৬৫
আমিয়া আক্তার

তোমার শহরটা আজ কেমন আছে? ৬৬
মো: রাফি উদ্দিন

কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ: মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৬৭
কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ (সরকারি কর্মচারী): মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৭০
কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ (বেসরকারি কর্মচারী): মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৭১
ম্যাগাজিন প্রকাশনা কমিটি-২০২৫: মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৭৩
শিক্ষক পরিষদ ২০২৫-২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ: মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৭৪
কলেজ এ্যালবাম: মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৭৫

অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ
উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

বাণী

মেহেরপুর জেলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ মেহেরপুর সরকারি কলেজ উচ্চায়ত জ্ঞান, দক্ষতা ও বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার ক্ষেত্রে এক অনন্য ইতিহাস রচনা করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সিইডিপি)'র অর্থায়নে শ্রেণি কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান, সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব ও লাইব্রেরি স্থাপন, কলেজ ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যবর্ধন, বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ নানা ধরনের শিখনবান্ধব ও উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অভিনবত্ব এনেছে। আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে পাঠদান ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ সৃজনের ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও কলেজটি নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সিইডিপি প্রকল্পের আওতায় ও নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কেন্দ্র। উদ্ভাবনী চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, বিজ্ঞানমনস্ক নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি এ বছর 'প্রতিচিন্তা' নামে একটি সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবোধ উজ্জীবনের মাধ্যমে মানবিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, প্রাগ্রসর চিন্তা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রাখবে। সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণে কলেজটি দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলায় যথার্থ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার আশাবাদ।

কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাববক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো।

(অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ)

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

মেহেরপুর সরকারি কলেজ 'প্রতিচিন্তা' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই সৃজনশীল উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে এ বছর একটি শিল্পসম্মত স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা কলেজের বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার ইতিহাসকে আরও উজ্জ্বল করবে। ৩৬ জুলাই রক্তস্নাত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন সাম্যের বাংলাদেশ গঠনে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কর্মে এ উদ্যোগ সহায়তা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রকাশনাটি বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজন সক্ষম, মূল্যবোধসম্পন্ন, সমৃদ্ধ ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারদর্শী নাগরিক ও ভবিষ্যৎমুখী প্রজন্ম গড়তে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রয়াসকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর
অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ
মেহেরপুর

বাণী

মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর জেলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে জ্ঞান, মানবিকতা ও দেশপ্রেমের আলো ছড়িয়ে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। এই কলেজ কেবল শিক্ষার কেন্দ্র নয়, বরং এটি একটি প্রগতিশীল চেতনার উন্মেষস্থল যেখানে তারুণ্য স্বপ্ন দেখে, চিন্তা করে, এবং কর্মে রূপান্তর ঘটায়।

জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও মননের বিকাশ একটি জাতির অগ্রগতির মাপকাঠি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য কেবল পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষা প্রদান নয়, বরং শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগতে আলো ছড়ানো। মেহেরপুর সরকারি কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন "প্রতিচিন্তা" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করার একটি অনন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের লেখা, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গবেষণা কিংবা অভিজ্ঞতা সবই এই প্রকাশনার মাধ্যমে সময় ও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে উঠবে।

"প্রতিচিন্তা"-র মাধ্যমে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সমাজভাবনায় নিজেদের প্রকাশের যে সাহস দেখিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

আমি বিশ্বাস করি, "প্রতিচিন্তা"-র প্রতিটি লেখা যেন একেকটি দীপ্ত আলোকরেখা যা আমাদের আগামী প্রজন্মকে সাহস, স্বপ্ন ও সত্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে।

"প্রতিচিন্তা" প্রকাশের সাথে সম্পাদনা পরিষদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি, "প্রতিচিন্তা" হয়ে উঠবে আমাদের কলেজের গৌরবগাথার একটি উজ্জ্বল অধ্যায়, যেখানে তারুণ্য ও চিন্তার জয়গান প্রতিফলিত হবে প্রতিটি পাতায়।

(প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর)

সম্পাদকের কথা

মো: খেজমত আলি মালিথ্যা

মানসম্পন্ন বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ একটি দূরহ কাজ। সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে এই দূরহ কাজটি সম্পন্ন করতে প্রতি বছর মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ করে চলেছে। বর্তমান প্রযুক্তির চাকচিক্যময় দুনিয়া থেকে শিক্ষর্থীদের ছাপার অক্ষরে আনন্দ খোঁজার পথ করে দেওয়ার এ-এক অনন্য প্রয়াস। মানুষমাত্রই সৃষ্টিশীল, বিশেষ করে কোমলমতি শিক্ষর্থীরাতো বটেই। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে একজন শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। সেই দক্ষতা হতে পারে প্রযুক্তিগত, ভাষাগত, বিজ্ঞান সম্পর্কিত এমনকি আধুনিক বিপণনের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কিত। আত্মোন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন নতুন পথ তৈরি করে দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম কাজ। একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে ব্লগ লিখে সোসাল মিডিয়ায় প্রকাশের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম হতে পারে। সাহিত্য বিষয়ে কনটেন্ট তৈরিতে করে গল্প, কবিতা লিখে সে সুনাম অর্জন করতে পারে। আর এর জন্য তাঁর লেখালেখির অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে কলেজ বার্ষিকী হতে পারে তাঁর হাতেখড়ি। শিক্ষার্থীরা যেন উন্নতমানের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান চিন্তা এবং কল্পনার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করতে পারে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রতিনিয়ত কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ করে তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি দেশকে গড়ে তোলার মূল কারিগর সে দেশে শিক্ষিত প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সমাজ। পুরাতনকে ভেঙে নতুন করে কিছু গড়ার সাহস একমাত্র তরুণরাই দেখাতে পারে। তরুণেরা চিন্তা করবে, স্বপ্ন দেখবে, সমাজ রূপান্তরে ভূমিকা পালন করবে, জাতির দুর্দিনে নেতৃত্ব দেবে, এমন অভিযোজান-সক্ষম তরুণ প্রজন্মই আমরা দেশের জন্য কামনা করে থাকি। প্রথাগত চিন্তার বাইরে গিয়ে তাঁরা যেন নতুন করে ভাবতে পারে, মুক্ত চিন্তার প্রসারে বাক-স্বাধীনতার অবাধপ্রবাহে আমাদের তরুণ সমাজ যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা এবারের বার্ষিক ম্যাগাজিনটির নামকরণ করেছি **'প্রতিচিন্তা'**। চিন্তার বৈকল্য থেকে বেরিয়ে এসে নতুন-চিন্তার পথ করে দেওয়ায় এ বার্ষিকী প্রকাশের মূল লক্ষ্য। আমরা চাই তাঁরা চিন্তায় আরও বেগবান হোক, গতিশীল হোক, নতুন বাংলাদেশ তাঁদেরকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখে তা তাঁদের অগ্রগামী পরিচ্ছন্ন সময় উপযোগী চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে **'প্রতিচিন্তা'** বার্ষিকীটির মাধ্যমে তা বাস্তবরূপ লাভ করুক।

লেখক হিসেবে প্রায় সকলেই শিক্ষানবীশ। তাই লেখা হিসেবে সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে হয়তো ষোলআনা আমরা পাবো না। তবে যদি সমস্ত লেখা থেকে আমরা কয়েকআনাও অর্জন করতে পারি, তাতেই বা কম কি? এর মধ্যে থেকেই হয়তো কেউ একদিন বড় লেখক, গবেষক, চিন্তক হয়ে উঠবে এ আশা আমরা করতেই পারি।

বার্ষিক ম্যাগাজিনটির বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ করতে অনেকের সহযোগিতায় আমরা ধন্য হয়েছি। বার্ষিক কমিটির প্রকাশনায় কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর এর অবদান অপরিসীম। তাঁর আগ্রহ আনুকূল্য ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া বার্ষিকীটি প্রকাশ অসম্ভব হয়ে যেত। তাঁর আর্থিক সহযোগিতায় বার্ষিকীটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। পত্রিকাটি প্রকাশে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, সেই সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মচারী শুভানুধ্যায়ীগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। বার্ষিকীটির বিভিন্ন স্তরে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তারপরও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ, সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু না। ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সকলকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। প্রকাশনায় বিভিন্ন পর্বে যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বিশেষ প্রতিবেদন

মেহেরপুর সরকারি কলেজ:

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৈদ্ধিক বিকাশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ

মেহেরপুর বাংলা অঞ্চলের এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ। অবিভক্ত বাংলার কৃষ্ণনগর জেলার মহকুমা হিসেবে মেহেরপুর (১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের সময় করিমপুর, চাপড়া ও তেহট্ট থানা মেহেরপুর মহকুমা থেকে পৃথক হয়ে ভারতের পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় আর মেহেরপুর ও গাংনী থানা নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে মেহেরেপুর মহকুমা থেকে যায় স্বমহিমায়। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষানুরাগী জমিদার ব্রজকুমার মল্লিকের পৃষ্ঠপোষকতায় মেহেরেপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি হাই স্কুল। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন-আরোহণের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি এন্ট্রান্স স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী, সচেতন জনগণ মেহেরপুর শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে, কিন্তু

আর্থিক সহযোগিতা ও উদ্যোগের অভাবে কোনো কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। বাধ্য হয়ে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য কৃষ্ণনগর কিংবা কলকাতায় যেতে হতো। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের পর মেহেরপুরের সাধারণ পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের দরজাটা রুদ্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে মেহেরপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল এ অঞ্চলের জনগণের প্রাণের দাবি। দেশভাগের পনের বছর পর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে 'মেহেরপুর মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জনগণের সেই দাবিটি পূরণ হয়। পূর্ববঙ্গের একটি সীমান্তবর্তী এলাকার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুরের শিক্ষানুরাগী, সমাজহিতৈষী মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে

প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরপুর কলেজ। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কীভাবে একটি জনপদের সমাজ রূপান্তর, স্বপ্ন পূরণ, মননচর্চা ও মানবসম্পদ সৃজনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেহেরপুর কলেজ। এলাকার জনগণের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকরণ, আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন ও উচ্চশিক্ষার বিস্তারে কলেজটির অবদান অপরিসীম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি জনপদের মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-চেতনা বিকাশেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এ কলেজটি। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের, ২২ জুলাই (১৩৬৯ বঙ্গাব্দে, আষাঢ়) বিপুল উৎসাহ- উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুর কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মহকুমা হাকিম নুরুন্নবী চৌধুরী (সিএসপি)। সেই থেকে প্রতিষ্ঠানটি আলো ছড়িয়ে চলেছে গ্রাম থেকে শহরে, এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে। প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন রফিকুল আলম। তিনি ছিলেন একাধারে সফল প্রশাসক ও কৃতী শিক্ষক। কলেজ পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন মহকুমা প্রশাসক নুরুন্নবী চৌধুরী (সিএসপি) এবং সদস্য সচিবের দায়িত্ব পেয়েছিলেন খ্যাতিমান আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবুল হায়াত।

সূচনালগ্নে মেহেরপুর মডেল হাইস্কুলে কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রায় দুই বছর যাবৎ কলেজের অ্যাকাডেমিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় মডেল হাইস্কুল থেকে। ১৯৬৪ সালের প্রারম্ভে মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের পূর্ব দিকে কলেজের নির্ধারিত স্থানে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। ১৯৬৪ সালের শেষদিকে কলেজের অ্যাকাডেমিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম মডেল হাইস্কুল থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৫ খিষ্টাব্দে ৮ হাজার ৬৫০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হয়। ওই বছরই মেহেরপুর কলেজ এইচ.এস.সি. পর্যায় থেকে স্নাতক কলেজে রূপান্তরিত হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি লাভ করে। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বিএ,

বিকম এবং ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বিএসসি পাস কোর্স চালু হয়। ১৯৭৯ সালের ৭ মে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। কলেজ জাতীয়করণকালে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন শহীদুল্লাহ খান। পাণ্ডিত্যে, প্রশাসনিক দক্ষতায় ও নেতৃত্বের গুণাবলীতে তিনি ছিলেন অনন্য। ১৯৯৯ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। বর্তমানে ৮টি বিষয়ে অনার্স এবং ৬ বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। স্নাতক পাস কোর্সের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে মাস্টার্স প্রথমপর্ব ও প্রাইভেট মাস্টার্স কোর্স চালু ও ১১২টি শিক্ষকের (অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক) পদ সৃজনের প্রচেষ্টা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১৯৬২ সালে অল্প ক'জন শিক্ষার্থী নিয়ে মেহেরপুর কলেজের যাত্রা শুরু। এখন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাত হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়া-লেখা করছে।

শিল্প-সাহিত্য-ক্রীড়া-সংস্কৃতিচর্চায় মেহেরপুর কলেজ :

শিল্প সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্রীড়াচর্চার ক্ষেত্রে এ কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। ষাটের দশকের শেষদিকে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলিত উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' এবং ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কলেজ ছাত্রসংসদের উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' এর মতো ক্ল্যাসিক নাটক মঞ্চস্থ হয়। আশির দশকে মঞ্চস্থ হয় কল্যাণ মিত্রের 'পাথর বাড়ি' ও 'সাগর সেচা মানিক', 'কবর'। অধ্যক্ষ ড. আনোয়ারুল করিম, কবি শামসুর

রাহমান ও গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে কলেজের আম্রকাননে উদযাপিত হয় বসন্ত উৎসব। মেহেরপুর সরকারি কলেজ থিয়েটার ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল হলে নাটক '৬ ডিসেম্বর' ও ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় নাট্যশালায় 'নীল বৈঠক' সফলভাবে মঞ্চস্থ করে। বাংলাদেশের খ্যাতিমান-কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের অনেকে এ কলেজের অধ্যয়ন করেছেন। নব্বই-এর দশকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সরকারি কলেজ তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃকলেজ কাবাডি প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে

সাফল্য অর্জন করে। কলেজের শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের মিলিত উদ্যোগে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে 'যুগপত্র' এবং ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে 'শব্দতরু' নামে দুটো স্যুভেনির প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত হয় 'সুবর্ণরেখা'। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০২৫। কলেজের পিঠাপুলি উৎসব জেলার সংস্কৃতিজনদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। ২০২৫ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে বিপুল উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৫ উদযাপিত হয়েছে সাড়ম্বরে, জেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান মনোনীত হয়েছেন কলেজের প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর।

কলেজের স্থাপনা ও ভবনসমূহ

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের অর্থায়নে নির্মিত হয় কলেজের মূল প্রশাসন ভবন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সাপ্লিমেন্টারি স্কিমের আওতায় ৪ লাখ টাকা ব্যয়ে মূল ভবনের পূর্বদিকে বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হয়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কলেজের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সরকারি অর্থায়নে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ছাত্রাবাসটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়, কিন্তু সরকারি বিধি-নিষেধ ও নানা রকম সামাজিক সমস্যার কারণে নতুন কোনো ছাত্রাবাস নির্মিত হয়নি। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করা ছাত্র সংসদ ভবন। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অর্থায়নে নির্মিত হয় আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর পাঁচতলা বিশিষ্ট একাডেমিক কাম পরীক্ষা ভবন ও পাঁচতলা বিশিষ্ট প্রশাসন ও কম্পিউটার ল্যাব ভবন। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয় পাঁচতলা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস। অ্যাকাডেমিক ভবনের সামনে রয়েছে বিশাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভেষজ বাগান, বৈশাখী চত্বর ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। প্রশাসন ও কম্পিউটার ল্যাব ভবনে স্থাপন করা হয়েছে চারটি সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব। এছাড়াও বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাস ইন্টারনেটও সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ সালে বর্তমানে অধ্যক্ষ মহোদয়ের তৎপরতায় নতুন সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ, কলেজ সৌন্দর্যবর্ধিতকরণ, ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রবর্তন, অনলাইন রেজাল্ট এবং শিক্ষার্থীদের সকল Payment ডিজিটালাইজেনশন করা হয়েছে। বাজকেট বল খেলার জন্য মাঠ নির্মাণ কাজ এবং কলেজের সীমানা প্রাচীর সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ চলমান রয়েছে।

গত শতকের ষাটের দশকে বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের মহেন্দ্রক্ষণে মেহেরপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলের জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি ও উচ্চশিক্ষাচর্চার ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের জনজীবনে যুক্ত হয় এক নতুন মাত্রা, সাধারণ মানুষ ও তাঁদের সন্তানদের মধ্যে জেগে ওঠে উচ্চশিক্ষা অর্জনের এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা। শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের বহুমাত্রিক কর্মতৎপরতায় মেহেরপুর শহরে সৃষ্টি হয় নতুন ধারার উচ্চায়ত সংস্কৃতি ও সামাজিক বাতাবরণ। রাজনৈতিক-সামাজিক ভাঙা-গড়ায়, সময়ের পরিক্রমায় শহরের অনেক কিছুই বদলে গেছে। কিন্তু কোনো পরিবর্তনই মেহেরপুর কলেজের ঔজ্জ্বল্য ম্লান করতে পারেনি। আশা করা যায়, আগামী দিনেও মেহেরপুর সরকারি কলেজ জেলার প্রধান ও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র: মেহেরপুর সরকারি কলেজ মহাফেজখানা

গ্রন্থনা: সম্পাদনা পরিষদ, কলেজ বার্ষিকী 'প্রতিচিন্তা'।

প্রবন্ধ

পলিথিন : সুবিধার ছায়ায় লুকানো বিপদ

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর

প্রতিদিনের জীবনে আমরা নানা ধরণের প্লাস্টিকজাত পণ্যের ব্যবহার করে থাকি। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য ও বহুল ব্যবহৃত পণ্য হচ্ছে পলিথিন। মানুষ পলিথিন পছন্দ করে কারণ এটি হালকা, সহজেই বাঁকতে পারে, দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়. সহজে ভেঙে যায় না, তৈরি করা সহজ এবং তৈরি করতে খুব বেশি খরচ হয় না। এটি সারা বিশ্বে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি ব্যবহারের পর আমরা যেখানে সেখানে ফেলে দিই। ফলে আমাদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত ড্রেনেজ সিস্টেমসহ স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন হচ্ছে। একসময় পলিথিন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে। কিন্তু এই সস্তা ও সহজলভ্য বস্তুটি আজ এক ভয়াবহ পরিবেশগত সংকটে রূপ নিয়েছে। আমরা হয়তো জানিও না, আমাদের ব্যবহৃত একটি ছোট পলিথিন ব্যাগ প্রকৃতিতে শত শত বছর ধরে টিকে থাকে এবং ধীরে ধীরে পরিবেশকে বিষিয়ে তোলে। এছাড়াও এটিকে আগুনে পোড়ালে পলিভিনাইল ক্লোরাইড কার্বন মনোঅক্সাইড উৎপন্ন হয় যা বায়ু দূষণ করে। এভাবেই পলিথিন হয়ে উঠেছে এক নীরব ঘাতক। একারণে বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালে প্রথম বারের মত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আলোকে পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, ব্যবহার, বিপণন এবং পরিবহন নিষিদ্ধ করে। তারপরেও পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ না হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার পূণরায়

২০২৪ সালের ১ নভেম্বর থেকে পলিথিন ও পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগের বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। এটি একটি সাহসী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ, যা আমাদের পরিবেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তবে, এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প সমাধানগুলোর ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে শুধু ঢাকা শহরে একটি পরিবার প্রতিদিন গড়ে চারটি করে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার

করে এবং প্রতিদিন ১ কোটি ৪০ লাখের বেশি পলিথিনের ব্যাগ একবার ব্যবহার করে তা যত্রতত্র ফেলে দেয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বলছে ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি পলিথিনের ব্যাগ জমা হচ্ছে।

একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, রাজধানীর লালবাগ, কামরাঙ্গীরচর এলাকায় প্রায় কয়েকশত প্লাস্টিক উৎপাদনের কারখানা আছে। লালবাগের চান্দিরঘাট এলাকায় প্রকাশ্যে চলে অবৈধ পলিথিনের উৎপাদন ও বিক্রি। সারা বিশ্বে পলিথিন দূষণ নিয়ে ব্যাপক মাথা ব্যাথার সৃষ্টি হয়েছে। এ-কারণে গবেষকরা বলছেন, বর্তমানের পলিথিন দূষণের মাত্রা বজায় থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ সাগরে মাছের চায়তে পলিথিনের খণ্ডিত অংশের সংখ্যা বেশি হবে যা ভয়ঙ্কর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পলিথিন কী?

পলিথিন এক ধরণের থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার যা ইথিলিন নামক রাসায়নিক যৌগ থেকে তৈরি হয়। এটি মূলত হাইড্রোকার্বন ভিত্তিক যৌগ যা প্রাকৃতিক গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম থেকে নিষ্কাশন করা হয়। পলিথিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি হালকা, নমনীয় এবং জল প্রতিরোধী। জার্মান রসায়নবিদ হান্স ফন পেখমান প্রথম পলিইথিলিন বা পলিথিন আবিষ্কার করেন। এটি

রাসায়নিক প্রতিরোধী, এছাড়াও পলিথিন শক্তভাবে বা আলগাভাবে প্যাক করা যায়। এটি এসিড, ক্ষারসহ অন্যান্য দ্রাবক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এ ধরণের প্লাস্টিক বায়োডিগ্রেডেবল বা পচনশীল না হওয়াতে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

পলিথিনের প্রকারভেদ

ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরণের পলিথিন রয়েছে যথা:

নিম্নঘনত্বের পলিইথিলিন (LDPE, Low-density polyethylene): এ ধরণের পলিথিন নরম এবং সহজে বাঁকানো যায়। এধরণের পলিথিন প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং বিভিন্ন বস্তু মোড়ানোর জন্য বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয়।

রৈখিক নিম্নঘনত্বের পলিইথিলিন (LLDPE, Linear low-density polyethylene): LDPE-এর চেয়ে শক্তিশালী। প্যাকেজিং এবং নমনীয় ফিল্মের জন্য ব্যবহৃত হয়।

উচ্চঘনত্বের পলিইথিলিন (HDPE, High-density polyethylene): এ ধরণের পলিথিন শক্ত এবং ঘন যা দুধের পাত্র, পাইপ এবং বালতির মতো জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ধরণের পলিথিন রাসায়নিকের বিরুদ্ধে ভালভাবে প্রতিরোধী।

ক্রস-লিঙ্কড পলিথিন (XLPE বা PEX): এটি গরম করে তৈরি করা হয়, যা এটিকে আরও ঘন করে তোলে। গরম জলের পাইপ, অন্তরক এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ধরণের পলিথিন প্রধানত বিল্ডিং পরিষেবা, পাইপওয়ার্ক সিস্টেম, হাইড্রোনিক রেডিয়েন্ট হিটিং এবং কুলিং সিস্টেম, গার্হস্থ্য জলের পাইপিং, উচ্চ ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তারের জন্য নিরোধক হিসেবে এবং শিশুর খেলার ম্যাটসমূহে ব্যবহৃত হয়।

পলিথিনের ইতিহাস

পলিথিন প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৩৩ সালে যুক্তরাজ্যের Imperial Chemical Industries (ICI) নামক প্রতিষ্ঠানে। তখন এটি ছিল এক গবেষণাগারিক দুর্ঘটনা। পরবর্তীতে এর উৎপাদনশীলতা এবং সহজ ব্যবহারবিধির কারণে এটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে ১৯৫০ এর দশক থেকে। আজ তা বিশ্বব্যাপী শিল্প ও গৃহস্থালী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পলিথিনের বৈশিষ্ট্য

- ✓ হালকা ও টেকসই;
- ✓ পানি প্রতিরোধী;
- ✓ সহজে বহনযোগ্য;
- ✓ সস্তা উৎপাদন খরচ;
- ✓ বিভিন্ন আকৃতি ও রঙে তৈরি সম্ভব।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার

- ✓ বাজারের ব্যাগ;
- ✓ খাবার মোড়ানো;
- ✓ বস্তা ও প্যাকেট;
- ✓ বোতল, কনটেইনার তৈরিতে;
- ✓ কৃষিকাজে মালচ ফিল্ম হিসেবে।

এই বহুমুখী ব্যবহারের কারণে পলিথিন অতি দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর ক্ষতিকর দিকগুলোও ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পলিথিনের প্রয়োগ

- ✓ **প্যাকেজিং সামগ্রীতে:** ব্যাগ, বোতল, খাবারের পাত্র এবং মোড়কের জন্য পলিথিনের ব্যপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটি প্লাস্টিকের প্যাকেজিংয়ের একটি বড় অংশ।
- ✓ **নির্মাণ সামগ্রীতে:** পাইপ, তার, অন্তরক এবং ফিল্মের জন্য পলিথিন ব্যবহার হয়। HDPE এবং XLPE ধরনরে পলিথিন নির্মাণ সামগ্রীতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।
- ✓ **স্বয়ংচালিত ইঞ্জিন:** পলিথিন জ্বালানী ট্যাঙ্ক, বাম্পার, ব্যাটারি কেস এবং গাড়ির ভিতরের জন্য বহুল ব্যবহৃত পণ্য যা এ সকল যন্ত্রাংশসমূহকে টেকসই দান করে।
- ✓ **কৃষি কাজে:** গ্রিনহাউসে ফিল্ম, পানি দেওয়ার টিউব এবং মাটিতে ফিল্মের জন্য পলিথিন বহুল ব্যবহৃত হয় যা গাছপালাকে আরও ভালোভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে।
- ✓ **স্বাস্থ্যসেবা কাজে:** অনেক প্লাস্টিক আছে যা নিরাপদ এবং পরিষ্কার বলে IV তরল, টিউব, গ্লোভস এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম ইত্যাদি মোড়কের কাজে ব্যবহৃত হয়।

- ✓ **টেক্সটাইল শিল্পে:** জলরোধী পোশাক, দড়ি এবং বাইরের সরঞ্জামের আচ্ছাদান তৈরীর জন্য পলিথিন ব্যবহার করা হয়।
- ✓ **খেলনা সামগ্রী মোড়কের কাজে:** অনেক পলিথিন নিরাপদ এবং নমনীয় হওয়ায় খেলনা এবং শিশুদের বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মোড়কের কাজে ব্যবহৃত হয়।

পরিবেশের উপর পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব

পলিথিন বা প্লাস্টিক পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। পলিইথিলিন, অন্যান্য কৃত্রিম প্লাস্টিকের মত, সহজে পরিবেশে মিশতে পারে না। এটি পরিবেশের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করে কারণ প্লাস্টিক বর্জ্য ভূমি থেকে মহাসাগর পর্যন্ত সর্বত্র জমে থাকে; যা প্রাণী এবং উদ্ভিদ জন্মানোর জায়গাগুলিকে প্রভাবিত করে এবং জীব বৈচিত্র্যের বাসস্থান, প্রাণ প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে। পলিথিনকে যদি পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে না তুলি তাহলে এর ব্যাপক ব্যবহার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করবে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে পৃথিবীব্যাপী প্রতি মিনিটে এক মিলিয়ন মানুষ বছরে গড়ে ৪০০টি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে থাকে। বংলাদেশের ক্ষেত্রে দৈনিক এক কোটি ৪০ লাখ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়াও প্লাস্টিক থেকে তৈরি করা টিস্যু ব্যাগের ব্যবহার ৩০ লাখেরও বেশি যা ক্ষতি করছে পরিবেশের।

মাটির গুণগত মানের অবনতি

পলিথিন মাটিতে শত শত বছর পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে। এটি মাটির স্বাভাবিক জলবায়ু ও জীবাণু কার্যক্রমকে ব্যাহত করে ফলে আমাদের দেশের কৃষি জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, গাছপালার সঠিকভাবে বৃদ্ধি ব্যহত হচ্ছে এবং ফসলের উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এসব কারণে অনেকে পরিত্যক্ত পলিথিন সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলছে যা কার্বন মনোঅক্সাইড সৃষ্টি করে পরিবেশকে মারাত্বক ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা

নর্দমা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থায় পলিথিন জমে গিয়ে পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যার ফলে শহরাঞ্চলে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ঢাকার মতো শহরে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ হচ্ছে পলিথিন।

দূষণের নেপথ্যে পলিথিনের ভূমিকা

পলিথিন এখন মানবসৃষ্ট দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। মাটির উর্বরতা নষ্ট, নদী-নালা এবং শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থার অচলাবস্থাসহ সব জায়গাতেই পলিথিনের ক্ষতিকর ছায়া বিস্তৃত। গ্রাম হোক কিংবা শহর, খাল-বিল হোক বা পুকুর, এমনকি আমাদের ঘরের আঙিনাও আজ পলিথিনে ভরপুর।

বায়ুদূষণ

পলিথিন পোড়ালে কার্বন মনোক্সাইড, ডাইঅক্সিন, ফুরান জাতীয় বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, যা বায়ুমণ্ডলে দূষণ সৃষ্টি করে এবং মানুষের শ্বাসতন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচিত।

স্থায়ী দূষণ তৈরিতে

পলিথিন প্রকৃতি থেকে সহজে চলে যায় না এবং আমরা এটি ফেলে দেওয়ার পরেও শত শত বছর ধরে স্থায়ী হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে এটি আবর্জনার স্তূপে, স্থলে এবং সমুদ্রে স্তূপীকৃত হয়। অনেকক্ষেত্রে আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেমকে বন্ধ করে ফেলে ফলশ্রুতিতে আমাদের চারপাশের জায়গাগুলি নোংরা হয়ে যায় এবং স্থায়ী পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি হয়।

জলজ প্রাণীর মৃত্যু

পলিথিন নদী, পুকুর বা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং অনেক সময় মাছ, কচ্ছপ বা অন্যান্য জলজ প্রাণী একে খাদ্য ভেবে খেয়ে ফেলে, যা তাদের অন্ত্রে জমে তাদের ক্ষতি করতে বা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভাঙা পলিথিন থেকে তৈরি ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের টুকরো সমুদ্রে পাওয়া যায়, যা খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে। এটি সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের ঘরবাড়ি নষ্ট করে, সমগ্র সামুদ্রিক জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে।

বাসস্থান ব্যাহত

পলিথিন আবর্জনা কেবল সমুদ্রকে নষ্ট করে না; এটি জমিরও ক্ষতি করে এবং এর রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে মিশে যায়। প্লাস্টিকের আবর্জনা বন এবং জলাভূমির মতো জায়গাগুলিকে ঢেকে ফেলে। পলিথিন থেকে সৃষ্ট দূষণ প্রাণীদের আচরণের ধরণ পরিবর্তন করে এবং তাদের জন্য বাচ্চা জন্মানো কঠিন করে তোলে। এটি নদী এবং হ্রদের তলদেশ ঢেকে রাখে, অক্সিজেন এবং আলো বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যা এই জলাশয়গুলিকে অসম্ভব ক্ষতি করে।

পলিথিনের প্রভাব আমাদের স্বাস্থ্যে

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, আমরা প্রতিদিন নয়, প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় পাঁচ গ্রাম মাইক্রোপ্লাস্টিক নিজের অজান্তেই গ্রহণ করছি খাবারের মাধ্যমে, বাতাসে শ্বাস নিয়ে বা পানির মাধ্যমে। এটি শুধু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য নয়, পুরো খাদ্যচক্রের জন্য এক ভয়াবহ সংকেত।

পলিথিনের বহুল ব্যবহারে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব তথা পরিবেশ দূষণ করে যা আমাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সৃষ্টি করে। নিম্নে স্বাস্থ্য ঝুঁকির ফলে যে সকল সমস্যা সৃষ্টি করে তা হলো:

- ✓ চোখ জ্বালা করা;
- ✓ শ্বাসকষ্ট হওয়া;
- ✓ লিভারের কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া;

- ✓ ক্যান্সার-এর মত দূরারোগ সৃষ্টি হওয়া;
- ✓ মাথা ব্যাথাসহ আরো বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয়;
- ✓ বিভিন্ন কাজের জন্য অনেকসময় আমরা উজ্জ্বল রঙের পলিথিন ব্যবহার করি যা সিসা ও ক্যাডমিয়াম বহন করে, যার সংস্পর্শে আমাদের চর্মরোগ সৃষ্টি হয়।

খাদ্য দূষণ ও কারসিনোজেনিক প্রভাব

পলিথিনের তৈরি অনেক পণ্য কারসিনোজেনিক (ক্যান্সার সৃষ্টি করে এমন) উপাদান ধারণ করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে এবং বিশেষত খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত পলিথিন খাদ্যের সাথে মিশে শরীরে প্রবেশ করতে পারে, যা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। পলিথিনে খাবার প্যাকিং করলে তা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দূষিত হয়ে যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভারের জটিলতা ইত্যাদি রোগের জন্ম দেয়। আমরা অনেক সময় নিম্নমানের পলিথিন ব্যবহার করে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বহন করি যা খাদ্যে একধরণের বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়াও আমরা পলিথিনের মাধ্যমে গরম খাবার বহন করি এবং তা খেলে মানুষের ক্যান্সার ও চর্মরোগের সংক্রমণ হতে পারে। অনেকসময় পলিথিন দ্বারা মাছ ও মাংস প্যাকিং করলে তাতে অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয় যা মানুষের বিভিন্ন ধরণের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সৃষ্টি করে।

বিষক্রিয়া ও হরমোন বিকৃতি

পলিথিন থেকে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক যেমন BPA (Bisphenol A) হরমোন বিকৃতি ঘটিয়ে শরীরের হরমোন সমতাকে বিরূপ প্রভাবিত করতে পারে। এটি বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর। এছাড়াও এটি শিশুদের বৃদ্ধিতে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের প্রজনন ক্ষমতায় বিরূপ প্রভাব ফেলে।

শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা

পলিথিনের জ্বলন বা সঠিকভাবে নিষ্পত্তি না হলে তা থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হতে পারে, যা শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত: বাচ্চা এবং বয়স্ক মানুষদের জন্য এটি বেশি ক্ষতিকর।

ত্বকের সমস্যা

পলিথিনের কিছু উপাদান ত্বকের সাথে সংস্পর্শে এলে এলার্জি বা ডার্মাটাইটিস (চামড়ার প্রদাহ) সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলাদেশে পলিথিনের বাস্তবতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি

২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার পলিথিন নিষিদ্ধ করলেও বাস্তবে এর ব্যবহার প্রতিদিনই বাড়ছে। বাজারে এখনও প্রায় সব দোকানে পলিথিনে পণ্য দেওয়া হয়। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঢাকাবাসী প্রতিদিন প্রায় ১৪-১৫ মিলিয়ন পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে।

আইন ও বাস্তবায়নের দুর্বলতা

পলিথিন নিষিদ্ধ হলেও যথাযথ নজরদারি ও আইন প্রয়োগের অভাবে এটি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এছাড়াও চোরাচালানপথে সীমান্ত দিয়ে ভারতে তৈরি পলিথিন প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে প্রবেশ করছে।

সচেতনতার অভাব

সাধারণ জনগণ এখনও সচেতন নয় পলিথিনের ক্ষতি সম্পর্কে। বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, এবং অল্প খরচে সহজলভ্যতার কারণে মানুষ এখনও পলিথিনকে বেছে নিচ্ছে যা আমাদের পরিবেশকে বাসযোগ্যহীন করে তুলতে সহায়তা করছে।

পলিথিন নিয়ন্ত্রণে সফল দেশসমূহ

১. **রুয়ান্ডা**

রুয়ান্ডা আফ্রিকার এই দেশটি ২০০৮ সালে পলিথিন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে এবং কঠোর আইন প্রণয়ন করে। আজ এটি 'প্লাস্টিক-ফ্রি' দেশের উদাহরণ। সীমান্তে পলিথিন নিয়ে প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আইন লঙ্ঘনকারীদের জেল ও জরিমানার মুখোমুখি হতে হয় এবং পলিথিনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয় বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ এবং কাপড়ের ব্যাগ। তাই রুয়ান্ডা এখন বিশ্বের অন্যতম পরিষ্কার দেশ হিসেবে পরিচিত। শহর ও গ্রাম সবখানেই পরিচ্ছন্নতার ছাপ দেখা যায়।

২. **কেনিয়া**

বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর পলিথিন নিষেধাজ্ঞা দেশ হিসেবে কেনিয়া পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৭ সালে কেনিয়া পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, ব্যবহার ও আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে ৪ বছরের জেল বা প্রায় ৪০,০০০ ডলারের জরিমানা। এ সকল সফল পদক্ষেপের কারণে কেনিয়াতে পরিবেশ দূষণ হ্রাস পেয়েছে এবং জনসচেতনতা অনেক বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা বিকল্প পণ্যে ঝুঁকেছেন।

৩. **ইউরোপীয় ইউনিয়ন**

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো পলিথিন ব্যবহার কমানোর জন্য 'পে ফর ব্যাগ' নীতি গ্রহণ করে। পলিথিন ব্যবহার ধীরে ধীরে কমানো এবং বিকল্প ব্যবহারের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও জনগণকে পুনঃব্যবহারযোগ্য ব্যাগ ও 'পলিবায়ো' ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। যার ফলে বেশিরভাগ দেশেই একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

৪. **চীন**

চীন পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে। ২০০৮ সাল থেকে চীন পাতলা পলিথিন নিষিদ্ধ করে এবং দোকানগুলোতে বিনামূল্যে ব্যাগ দেওয়া নিষিদ্ধ করে। ২০২০ সালে একবার ব্যবহারযোগ্য পলিথিনের উপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এসকল পদক্ষেপের কারণে চীনে পলিথিনের ব্যবহার প্রায় ৬০-৭০% কমে গেছে কিছু অঞ্চলে।

বাংলাদেশের পলিথিন নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশ পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারে বিশ্বের প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশ হলেও কার্যকর বাস্তবায়নে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ-এর মুখোমুখি। বাংলাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, পলিথিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা থাকলেও ব্যবহার কমছে না। ২০০২ সালে বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে পলিথিন নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু সে আইন কার্যকর হয়নি যথাযথভাবে। ফলে আজও শহরের সুপারশপ থেকে শুরু করে গ্রামের হাট-বাজার পর্যন্ত সর্বত্র পলিথিনের আধিপত্য বজায় রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ২০০২ সালে পাতলা পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণাকরণ

- ✓ বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালে ৫৫ মাইক্রনের নিচে পাতলা পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে।
- ✓ এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের প্রথম দেশ, যারা আইনগতভাবে পলিথিন নিষিদ্ধ করে।

২. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত)

- ✓ এই আইনের অধীনে প্লাস্টিক ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহারের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।
- ✓ আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে জরিমানা ও কারাদণ্ডের বিধান।

৩. বাংলাদেশ সরকার আবারো ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর থেকে পলিথিন ও পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগের বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। এটি একটি সাহসী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ, যা আমাদের পরিবেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তবে, এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প সমাধানগুলোর ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

৪. পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা

- ✓ পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধগুলো দ্রুত বিচার ও শাস্তির আওতায় আনতে পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে।
- ✓ তবে এই আদালতের কার্যকারিতা এখনও সীমিত।

৫. বিকল্প পণ্যের গবেষণা ও ব্যবহার

- ✓ পাটের তৈরি ব্যাগ (সোনালি ব্যাগ) উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ✓ এই ব্যাগ সম্পূর্ণ জৈব-ভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব।

৬. সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান

- ✓ গণমাধ্যম, স্কুল-কলেজ, এনজিও ও পরিবেশবাদী সংগঠনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চলছে।
- ✓ বিশ্ব পরিবেশ দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে পলিথিন বিরোধী কর্মসূচি পালিত হয়।

৭. নগর কর্তৃপক্ষের অভিযান

- ✓ বিভিন্ন সময় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে পলিথিন বিরোধী অভিযান চালায়।
- ✓ তবে এসব অভিযান অনেকটাই অনিয়মিত ও অস্থায়ী প্রকৃতির।

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:

- ✓ নিষিদ্ধ সত্ত্বেও বাজারে পলিথিনের অবাধ ব্যবহার;
- ✓ বিকল্প পণ্যের সহজলভ্যতা ও কম খরচে না পাওয়া;
- ✓ আইন প্রয়োগে দুর্বলতা ও দুর্নীতি;
- ✓ জনসচেতনতার ঘাটতি।

সম্ভাব্য উত্তরণের পথ:

- ❖ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে প্রণয়নকৃত আইনের সফল বাস্তবায়ন ও নিয়মিত নজরদারি করতে হবে।
- ❖ সোনালি ব্যাগের মতো উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- ❖ জনসচেতনতায় দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- ❖ ব্যবসায়ীদের বিকল্প ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া (প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা) বাড়াতে হবে।
- ❖ জনসচেতনতা বাড়াতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এলাকায় পলিথিনের ক্ষতি সম্পর্কে জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ পুনঃব্যবহারযোগ্য ব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- ❖ পচনশীল ময়লা ফেলার আগে প্লাস্টিক ও পলিথিনের বিভিন্ন সামগ্রী আলাদা করে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ যত্রতত্র পলিথিন না ফেলে তা একত্র করে একজায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ বাজার করার ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের বা কাপড়ের ব্যাগ সাথে রাখা ও ব্যবহার করার অভ্যাস করতে হবে।
- ❖ পলিথিনের দূষণ ও ব্যবহার কমাতে বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসাতে হবে এবং কার্যক্রম চালাতে হবে।
- ❖ পলিথিনের কারখানাগুলো বাজেয়াপ্ত করে সিলগালা করে দিতে হবে এবং উৎপাদকদের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে।
- ❖ জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে পলিথিন দূষণ সম্পর্কে অবগত রাখতে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ❖ দোকানে গিয়ে নিশ্চিত করা যে পলিথিন ব্যবহার বন্ধ হয়েছে।
- ❖ পলিথিনের ক্ষতি সম্পর্কে ও সচেতনতা সম্পর্কে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচার করতে হবে।

পলিথেনের বিকল্প উপাদান-এর ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, যেমন:

- কাপড়ের ব্যাগ;
- পাটের ব্যাগ;
- কাগজের ব্যাগ;
- বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার ;
- বাঁশ ও নারকেল পাতা থেকে তৈরি মোড়ক।

সোনালি ব্যাগ ও পাটের ব্যাগ

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত সোনালি ব্যাগ পাটের সেলুলোজ থেকে তৈরি, যা জৈবভাবে ক্ষয়যোগ্য, টেকসই ও জলরোধী। পলিথিনের মতোই কার্যকর, তবে পরিবেশের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। বারবার ব্যবহারযোগ্য এবং উৎপাদনেও পরিবেশবান্ধব।

চিত্র: সোনালী ব্যাগ

তুলার ব্যাগ

হালকা, ধোয়া যায় এবং বহুবার ব্যবহারযোগ্য। জৈব তুলার ব্যাগ পরিবেশবান্ধব হলেও চাষে বেশি পানি লাগে। তবুও এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং সৌন্দর্যপূর্ণ বিকল্প।

কাগজের ব্যাগ

সহজে পচনশীল ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য। হালকা পণ্য বহনের জন্য ভালো এবং সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করলে মাটির পুষ্টি বাড়ায়।

কাপড়ের ব্যাগ (লিনেন, মসলিন, ক্যানভাস)

টেকসই, ধোয়া যায় এবং বহুবার ব্যবহারের উপযোগী। ভাঁজ করা সহজ ও পরিবেশে দ্রুত ভেঙে যায়। একবার কিনে বহুবার ব্যবহার করা যায়।

উলের ব্যাগ

প্রাকৃতিক, শক্তিশালী ও জলরোধী। বছরের পর বছর টিকে থাকে এবং ব্যবহারের শেষে পরিবেশে মিশে যায়, কোনো ক্ষতি করে না।

বেতের ব্যাগ

দ্রুত বর্ধনশীল ও শক্তিশালী। ভারী জিনিস বহনে সক্ষম এবং দীর্ঘস্থায়ী। ঘন ঘন ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

শণের ব্যাগ

টেকসই ও পরিবেশ পরিষ্কারক গুণসম্পন্ন। কীটনাশক ছাড়াই জন্মে এবং তুলা-পাটের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

কচুরিপানা ব্যাগ

সৃজনশীল ও পরিবেশরক্ষা-মূলক উদ্ভাবন। কচুরিপানা থেকে তৈরি এই ব্যাগগুলি বায়োডিগ্রেডেবল ও জলজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

বাজারে পলিথিনের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ বিতরণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে পলিথিনের ব্যবহার কমাতে পাটের ব্যাগের ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাটের ব্যাগ উৎপাদন ও বিতরণে কাজ করছে।

BD Creationসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ উৎপাদন ও সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

BD Creation উৎপাদিত ব্যাগ

আধুনিক প্রযুক্তিতে পুরনো অভ্যাসের পুনরাবিষ্কার

সময় এসেছে ফিরে তাকানোর, পুরনো দিনের পরিবেশবান্ধব অভ্যাসগুলোর দিকে। একসময় মানুষ বাজারে যেতেন কাপড়ের ব্যাগ হাতে, দোকানিরা কাগজের ঠোঙায় জিনিসপত্র দিতেন, আর মাছ-মাংস মোড়ানো হতো কলাপাতা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানে। এখন হয়তো তা অচল বা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যেমন থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম ইতোমধ্যেই আধুনিকভাবে সেই অভ্যাসগুলো ফিরিয়ে আনা শুরু করেছে। সেখানে বর্তমানে সুপারশপগুলোতে কলাপাতা দিয়ে খাবার প্যাকেজিং একটি সাধারণ চিত্র হয়ে উঠেছে। এই বিকল্পগুলো কেবল পলিথিনের টেকসই প্রতিস্থাপন

নয়, বরং পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। দৈনন্দিন জীবনে এসব ব্যবহারে সচেতনতা ও অভ্যাসই হতে পারে প্রকৃতিকে রক্ষার হাতিয়ার।

বাংলাদেশে পলিথিন দূষণের বর্তমান প্রেক্ষাপট

পলিথিনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে আমাদের দেশের নদ-নদী দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং জলাবদ্ধতাসহ সামগ্রিক পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নদী-নালা খাল বিল দূষণে পলিথিনের প্রভাব

আমরা প্রতিদিন যে হারে পলিথিন ব্যবহার করি তা নদী-নালা খাল বিল দূষণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ফলে জলাশয়ের গভীরতা কমে যাওয়াসহ পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে পলিথিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সিটি করপোরেশন, জেলা শহর, পৌরসভা ও উপজেলা শহর এলাকায়। ফলে উক্ত এলাকার নদ-নদীগুলোই পলিথিন দূষণের শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, বংশী, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বরিশালের কীর্তনখোলা, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ও হালদা নদীর তলদেশে পলিথিনের পুরু স্তর পড়েছে। এছাড়া নরসুন্দা, নবগঙ্গা, সুরমা, করতোয়া, ইছামতিসহ বিভিন্ন নদ-নদী পলিথিন দূষণের ভয়ংকর কবলে পড়েছে। এ কারণে উক্ত নদীসমূহের তলদেশে কয়েক ফুট পুরু পলিথিনের স্তর জমা হয়েছে। এ ধরণের মারাত্মক দূষণের কারণে নদীর মাছসহ অন্যান্য জীববৈচিত্র্য প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এছাড়াও নদীর গভীরতা কমে যাওয়ার কারণে বন্যা, নদী ভাঙ্গনসহ নানাবিধ সমস্য দেখা দিয়েছে।

জলাবদ্ধতা সৃষ্টি

পলিথিনের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দেশের গ্রাম থেকে শুরু করে মফস্বল, ও শহরের প্রতিটি ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতা একটি মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করছে। আমরা জানি পয়:নিষ্কাষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম ব্যবহৃত হয় কিন্তু এই ড্রেনেজ সিস্টেম অতিরিক্ত ময়লায় ভরে যাওয়ায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। এসকল ময়লা বা আবর্জনার বড় অংশ হচ্ছে পলিথিন ও প্লাসিক বোতল। এক গবেষণায় বলা হয়েছে ঢাকা শহরের ৮০ শতাংশ ড্রেন পলিথিনে আবদ্ধ। ফলে মানুষ নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

চিত্র: ঢাকা শহরে পলিথিনের কারণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার চরম অবনতি

১. জলাবদ্ধতার কারণে ভাসমান পলিথিনে ঢাকা রাস্তা

ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতার একটি প্রধান কারণ হলো ড্রেনেজ ব্যবস্থায় পলিথিন ও প্লাস্টিক বর্জ্যের জমে থাকা। এটি বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে শহরের অনেক রাস্তা পানিতে তলিয়ে যায়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোতে প্রতিদিন গড়ে ২৪,০০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার ১০% প্লাস্টিক বর্জ্য। এই প্লাস্টিক বর্জ্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে।

চিত্র: ঢাকা শহরে অবস্থিত জলাশয়ে পলিথিনের স্তুপ

চিত্র: চট্টগ্রামে প্লাস্টিক-পলিথিন বর্জ্যে পরিপূর্ণ খাল

২. পলিথিন খেয়ে মৃত কচ্ছপ বা জলজ প্রাণী

সামুদ্রিক কচ্ছপসহ অনেক জলজ প্রাণী পলিথিনকে খাবার ভেবে খেয়ে ফেলে, যা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পলিথিন খাওয়ার ফলে তাদের অন্ত্রের ক্ষতি, ব্লকেজ এবং অপুষ্টি দেখা দেয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫০% এর বেশি সামুদ্রিক কচ্ছপ তাদের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে প্লাস্টিক খেয়ে থাকে, যা তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

ভবিষ্যতের জন্য আজকের সিদ্ধান্ত

আমরাও পারি। চাই শুধু সচেতনতা, আন্তরিকতা এবং কিছু ছোট ছোট পদক্ষেপ। পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যাগ ব্যবহার, পলিথিন এড়িয়ে চলা, নিজের পরিবার ও আশেপাশের মানুষকে সচেতন করা এসবই হতে পারে বৃহৎ পরিবর্তনের সূচনা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য, সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে আজ থেকেই আমাদের চিন্তা ও অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে।

এই নীরব ঘাতকের কবল থেকে বাঁচতে হলে আজ থেকেই প্রশ্ন তুলতে হবে আমি কী করতে পারি? আমরা কীভাবে রক্ষা করব আমাদের পরিবেশকে, আমাদের স্বাস্থ্যের ভবিষ্যতকে? এখনই সময় নিজের দিকে তাকানোর, কারণ পরিবর্তনের শুরু হয় নিজের ভেতর থেকেই।

উপসংহার

বাজার থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহনের সুবিধার কারণে প্রতিদিন আমরা পলিথিন ব্যবহার করছি, ব্যবহারের পর অবলীলায় তা ফেলে দিচ্ছি পরিবেশে, যেন এর কোনো পরিণতি নেই। অথচ এই অবহেলা এখন আমাদের পরিবেশের জন্য এক দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পলিথিন এক সময়ের প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হলেও এখন তা মানবজাতির জন্য নীরব ঘাতক হয়ে উঠেছে। এছাড়াও পলিথিনের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকগুলো এখনো আমাদের অনেকের কাছেই গুরুত্বহীন রয়ে গেছে। যদি আমরা পলিথিন ব্যবহার পরিহারের ক্ষেত্রে একসাথে কাজ না করি, তাহলে পলিথিন আরও অনেক বছর ধরে আমাদের গ্রহের ক্ষতি করতে থাকবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এটি শুধু পরিবেশ নয়, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপরও গুরুতর প্রভাব ফেলবে। তাই প্রশ্ন জাগে এই ভয়াবহ সংকটের দায়ভার কাদের? শুধু সরকারের? নাকি আমাদেরও? আসলে এই দায় কারও একার নয়; প্রতিরোধের দায়িত্ব আমাদের সবার। তাই আমাদের আর পিছনের দিকে তাকানোর সময় নাই। পরিবর্তনের শুরুটা হতে হবে আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে। আমাদের অভ্যাস, চাহিদা এবং চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনলেই আমরা এ সংকট মোকাবিলা করতে পারব এবং পলিথিনমুক্ত, স্বাস্থ্যকর ও টেকসই একটি পৃথিবী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারবো।

রেফারেন্স

১. পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার (DoE Reports, 2022)

২. Plastic Pollution Coalition: https://www. plasticpollution-coalition.org

৩. World Economic Forum on Plastic Use, 2023

৪. "Polyethylene in the Environment", Journal of Environmental Management, Elsevier, 2021

৫. দৈনিক প্রথম আলো, "পলিথিন: নিষিদ্ধ, তবুও ব্যবহৃত", ২০২৪

৬. The Guardian: "How Rwanda became the cleanest country in Africa", 2021

৭. https://aastha.life/blog/পলিথিন-কেন-পরিবেশ-ও-স্বাস্থ্যের-জন্য-মারাত্মক-ঝুঁকিপূর্ণ বিশাল সাহা, স্বাস্থ্য ও সচেতনতা // মার্চ, ২২, ২০২২

৮. World Health Organization (WHO): "Chemical Hazards in Polymers.

৯. National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS): "Health Effects of Plastics and Microplastics.

১০. Environmental Protection Agency (EPA): "Polyethylene and Its Health Risks.

লেখক পরিচিতি: প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

প্রবন্ধ

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : একটি পর্যালোচনা

মো: কাউছার আলী

আমাদের সমাজে হোমিও চিকিৎসাকে গরীব মানুষের চিকিৎসা বলা হয়ে থাকে। সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে– 'যাঁর নেই কোন গতি সেই করে হোমিওপ্যাথি।' যাঁর নেই কোন গতি বলতে রোগীর কথা বলা হয়েছে নাকি চিকিৎসকের কথা বলা হয়েছে তা আমার ঠিক জানা নেই। তবে আরও একটি কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল যাঁর নেই কোন গতি সেই করে ওকালতি। তবে এই কথাটির এখন আর কোন ব্যবহার নেই কারণ ইতোমধ্যে এই পেশাটি সমাজের অনেক মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসাবে মানুষ মেনে নিয়েছে। এই দুইটি কথা ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি। তবে এখন মনে হচ্ছে কথাটা চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। কারণ আর্থিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ রোগীরায় সাধারণত হোমিও চিকিৎসা গ্রহণ করে; আবার অন্য কোন ভাল পেশার সন্ধান না পেয়ে অনেকেই হোমিও চিকিৎসক হন। তবে কথাটি যাঁর সম্পর্কেই বলা হোক না কেন যাঁরা হোমিও ডাক্তার বা হোমিওপ্যাথির রোগী তাদেরকে অনেকেই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তাঁরা ভাবে এতে সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক লোক আছে যাঁরা হোমিও কথাটা শুনলেই নাক সিটকায়। আবার অনেক লোক আছে যাঁরা ছোট খাট যে কোন সমস্যায় হোমিও চিকিৎসাকে অত্যন্ত নির্ভরশীল মনে করে। তাঁদের অনেকে আবার আর্থিকভাবেও যথেষ্ট সামর্থ্যবান। যাঁরা হোমিও চিকিৎসাকে সেকেলে বা অকাজের চিকিৎসা হিসাবে যুক্তি খাড়া করে তার কিছু কারণ থাকতে পারে-

১. তাঁরা হয়তোবা কখনও হোমিও চিকিৎসা নিয়ে সুফল পাননি।
২. অথবা শুনেছেন যে হোমিও ঔষধে কাজ হয় না।
৩. অথবা এই চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণা নেই।

লোক মুখে শুনেছেন যে হোমিও চিকিৎসা একটা বাজে চিকিৎসা পদ্ধতি। এতে কোন ঔষধ থাকে না। শুধু পানি পড়া থাকে। এই পানি পড়া খেয়ে যদি রোগ ভালো হতো তাহলে পৃথিবীর সব লোক এদিকেই আসতো। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে লোকে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি শিখতো না আবার রোগীরাও এত টাকা খরচ করে এত হয়রান হয়ে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নিতে দেশ-বিদেশে পাড়ি জমাত না। কিন্তু যদি সমাজে একটা উদাহরণও থাকে যে কোন একজন রোগী এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় ভালো না হওয়ার পরেও হোমিও চিকিৎসায় উক্ত রোগী ভালো হয়েছেন। সেটা হতে পারে বড় কোন এ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের ব্যর্থতা বা সাধারণ কোন ডাক্তারের ব্যর্থতা অথবা এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা। এই ধরণের কথা আমরা অনেক সময় শুনে থাকি। তবে সব ক্ষেত্রে আমরা এর সত্যতা যাচাই করে দেখি না। যাঁরা হোমিও চিকিৎসাকে ভুল চিকিৎসা বলে সম্বোধন করে তাঁরা এটাকে গুজব বলে উড়িয়ে দেবেন আর যাঁরা হোমিও চিকিৎসাকে বিশ্বাস করেন তাঁরা এটাকে সত্য বলে মেনে নেবেন। তবে এই কথাটা হয়তোবা সবাই জানে যে হোমিওপ্যাথিতে অনেক সময় অনেক অসাধ্য সাধন হয়। তার মানে হোমিও ঔষধে কাজ হয় বা রোগী ভালো হয়, বিষয়টি সকলেরই জানা আছে বা শোনা আছে। কিন্তু কিভাবে হয় তা আমরা ভেবে দেখি না। তবে একটি রোগীও যদি ভালো হয় তবে বেশির ভাগ অথবা আরও বেশি রোগী কেন ভালো হয় না। এর কারণ ঔষধ নয়, ডাক্তার। কারণ অনেক ডাক্তারই হোমিও শাস্ত্রের মূলমন্ত্র অনুযায়ী চিকিৎসা করেন না। নিজের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন। অথবা যে পরিমাণ জানা-শোনা বা পড়া-লেখা দরকার সেই পরিমাণ পড়া-লেখা অনেক ডাক্তারেরই থাকে না। ফলে ঔষধ নির্বাচনে ভুল হয়। আর ঔষধ ভুল হলে রোগীও ভালো হবে না। ফলে আবার সেই বদনাম। রোগী ভাল না হওয়া সেটা হোমিওপ্যাথিতে যেমন আছে এ্যালোপ্যাথিতেও তেমনি আছে। এ্যালোপ্যাথিতে রোগ ভালো না হলে তখন হয় ডাক্তারের দোষ। আর হোমিওপ্যাথিতে রোগ ভালো না হলে সেটা হয় ঔষধের দোষ। কিন্তু কেন আমরা ঔষধের দোষ দিই? আমরাতো শুনেছি বা জেনেছি যে হোমিও চিকিৎসার দ্বারা অনেক জঠিল রোগী ভালো হয় বা হয়েছে। তাহলে এখন কেন আমরা ঔষধের দোষ দিচ্ছি। কেন ডাক্তারের দোষ দিচ্ছি না? ব্যর্থতা সব চিকিৎসা পদ্ধতিতেই আছে। আবার অনেক রোগী আছে যাঁদের সমস্যা ভালো হতে চায় না। একই ধরণের সমস্যা হয়তোবা অন্য রোগীর ক্ষেত্রে ভালো হয়েছে। আবার অনেক রোগ আছে যা ভালই হয় না শুধু ভালো থাকে। এই ধরণের সমস্যা সব ধরণের পদ্ধতিতেই আছে। অনেক রোগী আছে যাঁরা বহু বছর যাবৎ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করে ভালো থাকে কিন্তু ভালো হয় না। তাতে তাঁদের কোন আপসোস নেই কারণ তাঁরা মনে করে যে এই রোগ ভালো হবার নয় যে কয়দিন বাঁচবো ঔষধ খেয়েই বেঁচে থাকব। কিন্তু সেই রোগীই যদি কখনো বিরক্ত হয়ে হোমিও চিকিৎসকের নিকট যায় তখন তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই অস্থির হয়ে যায়, কেন ভালো হচ্ছে না? দুই মাস তিন মাস হলো এখনও ভালো হচ্ছে না, এইভাবে তো ঔষধ খাওয়া যাবে না। ফলে বাদ দিয়ে আবারও সেই এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেবন যা বছরের পর বছর খাবে।

হোমিও চিকিৎসায় যে রোগীরা ধৈর্য ধারণ করতে চায় না এর কারণ হতে পারে আস্থার সংকট। এটা একদিনে তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর হোমিও চিকিৎসা করেও যখন কাঙ্ক্ষিত কোন

ফলাফল পাওয়া যায় না তখন রোগী বা তার আত্মীয়- স্বজনেরা বলতেই পারেন এটা একটা বাজে চিকিৎসা পদ্ধতি। হোমিও চিকিৎসকরাও নির্দ্বিধায় রোগীকে ভালো করে দেবে বলে আশ্বস্ত করে আটকে রাখে। তাঁরা রোগীকে ভালো কোন হোমিও চিকিৎসকের নিকট পাঠান না। হোমিও চিকিৎসকরাও ভাবে তাঁরাতো চেষ্টা করছেনই। ভালো কোন ডাক্তার কি আর এমন চিকিৎসা দিবে। আমি যে ঔষধ দিচ্ছি তাঁরাওতো এই সকল ঔষধই দিবেন। কিন্তু এটা ঠিক না। হোমিও চিকিৎসাকে যদি কেউ হালকাভাবে দেখে সেটা ভুল হবে। কারণ হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি একটি জঠিল চিকিৎসা পদ্ধতি। এই জটিল বিষয়টি আয়ত্ব করতে গেলে প্রচুর পড়া-লেখা করা দরকার, জানা দরকার, গবেষণা দরকার। পৃথিবীর যত বড় বড় হোমিও চিকিৎসক তার বেশির ভাগই এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। এই রকম উদাহরণ বাংলাদেশেও প্রচুর আছে যাঁরা এমবিবিএস পাশ করার পর পেশা জীবনে হোমিও চিকিৎসক হয়েছেন এবং তাঁরা যথেষ্ট সুনামের সাথে চিকিৎসা করছেন। এখানে রোগ নয় রোগী চিকিৎসা করতে হবে। রোগী চেনা খুবই কঠিন। এই জন্যই ভালো চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে। সাধারণ সর্দি, কাশি, জ্বর-জ্বালা, পেটে ব্যথার চিকিৎসা যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু জটিল কোন সমস্যা যা রোগী দীর্ঘদিন যাবৎ শরীরে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন যা কমে আবার বাড়ে আবার কমে আবার বাড়ে এভাবেই চলতে থাকে। এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো চিকিৎসকের নিকট যেতে হবে।

আমরা সাধারণত এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কোন ডাক্তার দেখায়। তাতে ভালো না হলে উক্ত ডাক্তার রোগীকে তাঁর চায়তে বড় কোন ডাক্তারের নিকট রেফার করুন বা না করুন রোগী কিন্তু বেশি দিন সেই ডাক্তারের নিকট ঔষধ খাবেন না। তিনি তখন পুর্বের চায়তে বড় ডিগ্রিধারী কোন ডাক্তারের নিকট যাবেন। তাতে কাজ না হলে আরও বড় ডাক্তারের নিকট যাবেন। দেশের ডাক্তারের নিকট কাজ না হলে ভারত থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর বা আমেরিকার স্বনামধন্য কোন হাসপাতালে যাবেন। কখনও ভাববেনই না এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা আমার সমস্যার সমাধান হবে না। তাঁরা কখনই ঔষধের দোষ দেবেন না। প্রত্যেকের ধারণা সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় হলে অবশ্যই ভালো হবে। কিন্তু হোমিও-এর ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনাটা একটু ভিন্ন রকম। মহল্লার কোন হোমিও চিকিৎসকের নিকট একবার দুইবার ঔষধ খাওয়ার পর ব্যথা শুরু হয়ে গেলে ঔষধে কাজ হয় না। এখানে আমরা ঔষধকে দায়ী করছি। ভালো কোন ডাক্তার খোঁজ করছি না। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কারণে বছরের পর বছর এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ খেয়ে যায়। তাঁরা ধরে নেয় মরার আগ পর্যন্ত আমাকে ঔষধ খেয়ে যেতে হবে। কিন্তু হোমিও চিকিৎসা শুরুর পর থেকেই মনে করতে থাকবে ভালো হচ্ছে না। এত দিন কি ঔষধ খাওয়া যায়!

সকল ক্ষেত্রে সকল চিকিৎসা পদ্ধতি সমানভাবে কার্যকরি হয় না। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার বিস্ময়কর সাফল্য অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। যেই সময় হোমিও চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই সময়ের এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা আর আজকের এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা এক জায়গায় নেই। বহু রোগী আছে যাঁরা বছরের পর বছর একই রোগে কষ্ট করার পরেও ভালো হয়নি কিন্তু তাঁর যে অপারেশন দরকার ছিল সেই অপারেশনের জায়গায় রোগি যায়নি। অনেক জঠিল অপারেশন খুব সহজেই এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় করা সম্ভব হচ্ছে এবং রোগী খুব অল্প সময়ের ভিতরে ভালো হয়ে যাচ্ছেন। যেখানে অপারেশন করা দরকার সেখানে অপারেশন করায় লাগবে। বছরের পর বছর হোমিও ঔষধ খেলেও ঐ সকল সমস্যার সমাধান হবে না। হোমিও চিকিৎসকদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে না। এই রোগটা ভালো হওয়ার জায়গায় আছে কি নেই তা তাঁরা জানেন না। ফলে চেষ্টা করতে থাকে। যা ঠিক নয়, কারণ হতে পারে সেটা অপারেশনের বিষয়। অপারশন করলে অতি সহজেই সেটা ভালো হয়ে যাবে।

আবার যে সমস্ত রোগের আকারগত কোন পরিবর্তন হয়নি শুধু কার্যগত পরিবর্তন হয়েছে সেই জায়গাতে হোমিও ঔষধ খুব ভালো কাজ করতে পারে। তবে সর্বক্ষেত্রেই হোমিও নীতি অনুযায়ী হোমিও চিকিৎসা হওয়া চায়।

এখন হোমিও নীতি কি? এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। আমরা সাধারণভাবে মনে করি হোমিও ডাক্তার তাঁর দোকান থেকে যখন কোন ঔষধ দেন তাই হোমিও চিকিৎসা। হোমিও একটা শাস্ত্র। এর একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মের বাইরে গিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করলে তাকে আর হোমিও চিকিৎসা বলা যাবে না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূলমন্ত্র তিনটি।

১। সদৃশ লক্ষণ অনুসারে ঔষধ নির্বাচন;
২। একই সময়ে একটি মাত্র ঔষধ নির্বাচন;
৩। সূক্ষ্মতম মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ।

কিন্তু আমরা সাধারণত এই নিয়মে চিকিৎসা হতে দেখছি না। একের অধিক ঔষধ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটা যেমন হোমিও শাস্ত্রের নীতির বাইরে তেমনি মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকর। সাধারণত হোমিও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সকল অসামঞ্জস্যাগুলো চোখে পড়ে তা হল–

সঠিকভাবে কেস টেকিং না করে ঔষধ নির্বাচন। এতে ঔষধ নির্বাচলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

একের অধিক হোমিও ঔষধ প্রয়োগ। হোমিও ঔষধের সাথে এ্যালোপ্যাথি, হোমিও ঔষধের সাথে হারবাল, হোমিও-এর সাথে বায়োকেমিক এবং প্রয়োজনের তুলনায় অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ। এতে হয়তোবা কোন রোগের সাময়িক উপশম হলেও রোগী হিসাবে সে ব্যক্তি ভালো থাকে না। একটা গেলে আর একটা উপসর্গ তৈরি হয়। কারণ হোমিও চিকিসার মূলমন্ত্র রোগ নয় রোগী চিকিৎসা।

লেখক পরিচিতি: মো: কাউছার আলী, সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

প্রবন্ধ

ব্লু-ইকোনমির বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও অগ্রগতি

ড. সঞ্জয় বল

ভূমিকা

ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি হচ্ছে সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি। ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি (পাউলি ২০১০, ৩৮৬) ভবিষ্যতের অর্থনীতির রূপরেখা প্রণয়নের জন্য একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব মডেল হিসেবে ব্লু-ইকোনমির ধারণা দেন। সমুদ্র ব্যবহৃত হয় মৎস্য সম্পদ আহরণে। এ সম্পদের মাধ্যমে মানুষ খাবার চাহিদা মেটায়। সমুদ্র পণ্য পরিবহনের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া সমুদ্র নানা ধরনের প্রাণীজ প্রোটিন, খনিজ সম্পদ যেমন বালি, লবণ, কবাল্ট, গ্রাভেল, এবং কপার ইত্যাদির উৎস এবং তেল ও গ্যাসের আহরণক্ষেত্র হিসেবে সমুদ্র প্রয়োজন হয়। এসব উপাদান সমূহের সমষ্টিকেই বলা হয় ব্লু-ইকোনমি।

সারা বিশ্বেই ব্লু-ইকোনমির ধারণা বিকশিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বাংলাদেশে ব্লু-ইকোনমি আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য উৎপাদন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, পরিবেশের ঘাত প্রতিঘাত সহনক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি জড়িত (নিনাওই ২০১৭, ১)। প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিক সমঝোতা বৃদ্ধি, নথি বা তথ্য, সামুদ্রিক পণ্য উদ্ভাবন ও ভিন্নতা সৃষ্টি করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা জারি রাখা, জনগণের ভেতর সচেতনতা সৃষ্টি, বিপণন কৌশল বের করা, উপকূলীয় অঞ্চলে দক্ষ জনবল তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অবদান মাত্র ৯ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অথবা ৬ শতাংশ (DoF, 2022) । দেশের স্থলভাগের প্রায় সমপরিমাণ সমুদ্রসীমায় এখন মূল্যবান সম্পদের ভান্ডার। ভারত ও মিয়ানমার থেকে অর্জিত সমুদ্রসীমায় ২৬টি ব্লক রয়েছে (MoFA, 2014)। ইজারা দিয়ে এসব ব্লক থেকে প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া সম্ভব। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১৭ সালে 'ব্লু-ইকোনমি সেল' গঠন করে সরকার। বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতিতে উন্নয়ন আনার লক্ষ্যে জীব ও জড় সম্পদ আহরণ, মনুষ্য সৃষ্ট স্থাপনাসমূহ, জ্বালানি উৎপাদন, গবেষণা ও সমীক্ষা, স্থলভিত্তিক পরিবহন ও ব্যবসা, জাহাজ নির্মাণ ও পর্যটনের প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি দরকার অপ্রচলিত প্রজাতির সন্ধান, সামুদ্রিক বায়োটেকনলজি, তেল গ্যাসের খনি সন্ধান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সমুদ্র পর্যটনের প্রসার, সমুদ্র দূরত্বজনিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।

বিশ্ব অর্থনিতিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান ও গুরুত্ব

২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে তখন সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। সেই লক্ষ্যে জাতিসংঘ ২০১৫ সাল পরবর্তী যে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তার মূলকথাই হচ্ছে ব্লু-ইকোনমি। আর ব্লু-ইকোনমির মূল ভিত্তি হচ্ছে টেকসই সমুদ্র নীতিমালা। বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি বহুবিধভাবে অবদান রেখে চলেছে। বছরব্যাপী ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। বিশ্বের ৪৩০ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের যোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও প্রাণি। পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানী তেল সরবারহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে।

সমগ্র বিশ্বে ব্লু-ইকোনমি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে যতগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে তার সবগুলোতেই ব্লু-ইকোনমি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। ২০১২ তে রিও+২০, সমুদ্র বিষয়ক এশীয় সম্মেলন, ২০১৩ সালে বালিতে অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা এবং ব্লু-গ্রোথ ইত্যাদি সম্মেলনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়নসংস্থা (OECD), জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), বিশ্বব্যাংক, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ন কৌশলের মূলেও থাকছে ব্লু-ইকোনমি। আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট-বড় দেশ ব্লু-ইকোনমি নির্ভর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করেছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির সিংহভাগ সমুদ্র নির্ভর। সাম্প্রতিক সময়ে দেশটি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের মূল্যমান জাতীয় বাজেটের দশগুণ হবে। The Jakarta Post এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে The Lombok Blue Economy বাস্তবায়ন কর্মসূচি ৭৭ হাজার ৭০০ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করার পাশাপাশি প্রতিবছর ১১৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়

করবে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৪ সালে তাঁদের মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) ক্ষেত্রে প্রথমে ব্লু-ইকোনমির অবদান পরিমাপ করার চেষ্টা করে। বর্তমান সময়ের কিছু দেশের জাতীয়, আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সমুদ্র ভিত্তিক অর্থনীতির পরিমাপ আলোচনা করা হলো।

- **অস্ট্রেলিয়াঃ** বর্তমান সময়ে GDP-তে ব্লু-ইকোনমির অবদান ৪৭.২ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার যা তাঁদের মোট জিডিপির ৩ শতাংশের বেশি। অস্ট্রেলিয়া ইতোমধ্যে ২০১৫- ২০২৫ সাল পর্যন্ত ব্লু-ইকোনমি দশক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সেই হিসেব অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান হবে ১০০ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার।
- **চীনঃ** গত ৫ বছর সময়ে চীনের অর্থনীতিতে ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চীনের জিডিপির ১০ শতাংশ এবং বলা হচ্ছে যে ২০৩৫ সাল নাগাদ জিডিপিতে মেরিন সেক্টরের অবদান হবে ১৫ শতাংশ।
- **ইউরোপিয়ান ইউনিয়নঃ** বাৎসরিক জিভিএ (Gross Value Added) ৫০০ বিলিয়ন ইউরো এবং ৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে।
- **আয়ারল্যান্ডঃ** ২০১৬ সালে মোট জিভিএ ছিল ৩.৩৭ বিলিয়ন ইউরো যা জিডিপির ১.৭ শতাংশ।
- **মরিশাসঃ** ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল সময়ে জিডিপিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান ছিলো গড়ে ১০ শতাংশ।
- **যুক্তরাষ্ট্রঃ** ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান ছিলো ৩৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা তাঁদের মোট জিডিপির ২ শতাংশ এবং ৩ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল।

বৈশ্বিক সমুদ্র অর্থনীতি থেকে আউটপুট সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরণের হিসাব-নিকাশ করা হচ্ছে। গ্লোবাল ওশান কমিশন (২০১৪) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী, মেরিন ও উপকূলীয় উৎপাদিত সম্পদের মোট বাজার মূল্য ৩.০০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট রাজস্ব এর পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ২.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (Golden et al. 2017)।

ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ

অর্থনৈতিক খাতসমূহ	কর্মসূচি/কার্যক্রম
মৎস্য আহরণ	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষ, সামুদ্রিক পক্রিয়াকরণ
জাহাজ চলাচল ও জাহাজ ব্যবস্থাপনা, বন্দর এবং সামুদ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহায়ক পরিসেবা	জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত, জাহাজের স্বত্বাধিকার এবং পরিচালনা, জাহাজ প্রতিনিধিত্ব এবং দালালি (Shipping Agent & Broker), জাহাজ ব্যবস্থাপনা, মাছ ধরার নৌকা এবং বন্দর প্রতিনিধিত্ব, বন্দর, বাণিজ্য, জাহাজ সরবরাহ, কন্টেইনার শিপিং পরিষেবা, খালাশি, রোল অন-রোল অফ অপারেটর, শুল্ক গ্রহণ, মালবাহী জাহাজ ফরওয়ার্ডার, নিরাপত্তা এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি	ঔষধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, সামুদ্রিক শৈবাল চাষাবাদ, শৈবালজাত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত, সামুদ্রিক জৈব পণ্য।
খনিজ পদার্থ	তেল ও গ্যাস, গভীর সামুদ্রিক খনি (বিরল ধাতু, হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধ্যান)
সামুদ্রিক নবায়নযোগ্য শক্তি	বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন, সমুদ্রের ঢেউ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, জোয়ারের ঢেউ হতে শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি
সামুদ্রিক পণ্য	নৌকা মেরামত, জাহাজ মেরামত, জাল তৈরি, নৌকা এবং জাহাজ নির্মাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রের যোগান দান, জলসেচন প্রযুক্তি, সমুদ্র শাসন, সামুদ্রিক শিল্প প্রকৌশল
সামুদ্রিক পর্যটন ও অবকাশ	সমুদ্রে মৎস্য শিকার, সমুদ্র তীরে মৎস্য শিকার, সমুদ্রে নৌকা পরিষেবা, সমুদ্রে নৌকা চালনা, ওয়াটার স্কিইং, জেট স্কিইং, সার্ফিং, সেইল বোর্ডিং, সী কায়াকিং, স্কুবা ড্রাইভিং, সমুদ্রের সাঁতার, উপকূলীয় এলাকায় পাখি, তিমি, ডলফিন প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবকাঠামো পরিদর্শণ, সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ এবং দ্বীপ ভ্রমণ ইত্যাদি
সামুদ্রিক স্থাপনা নির্মাণ	সামুদ্রিক স্থাপনা নির্মাণ এবং প্রকৌশল
সামুদ্রিক বাণিজ্য	সামুদ্রিক আর্থিক সেবা, সামুদ্রিক আইনি সেবা, সামুদ্রিক বীমা, জাহাজ বিনিয়োগ ও এ সম্পর্কিত সেবা, চার্টারার, মিডিয়া ও প্রকাশনা
সামুদ্রিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা এবং গবেষণা	সামুদ্রিক প্রকৌশল পরামর্শ দাতা, আবহাওয়া সংক্রান্ত পরার্মশ দাতা, পরিবেশ সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা, জল-জরিপ পরামর্শ দাতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শ দাতা, আইসিটি সমাধান, ভৌগোলিক তথ্য সেবা, প্রমোদ তরী নকশা, সাবমেরিন টেলিকম শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি

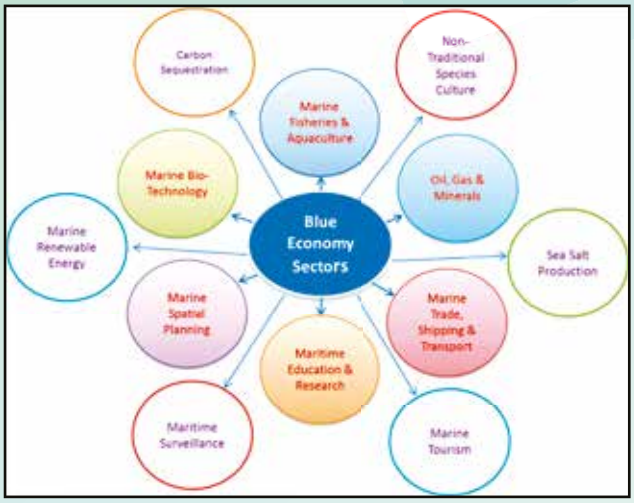

চিত্রঃ ব্লু-ইকোনমির সেক্টরগুলো

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় এবং ব্লু-ইকোনমি

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ায় মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। সাথে আছে ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণীজ-অপ্রাণীজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রে বিরোধপূর্ণ ১৭টি ব্লকের ১২টি পেয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের কাছ থেকে দাবিকৃত ১০টি ব্লকের সবগুলো পেয়েছে বাংলাদেশ। দুই বছরের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত এ রায় দু'টিকে প্রত্যেকেই বাংলাদেশের 'সমুদ্র বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। এ রায়ে বাংলাদেশের স্থলভাগের বাইরে জলসীমায় ও আরেক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। এখন এই বিজয়কে প্রকৃতার্থে অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ এর সম্পদ ব্যবহার করে আমাদের উন্নয়নকে তরান্বিত করতে হবে।

ব্লু-ইকোনমি (সুনীল অর্থনীতি) উন্নয়নে বাংলাদেশের ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার মাত্র তিন বছরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ১৯৭৪ সালে Territorial Waters and Maritime Zones Act পাস করে। এ ছাড়া ভারত ও মায়ানমার সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে আলোচনাও ১৯৭৪ সালে শুরু করা হয়। পরবর্তীতে নব্বইয়ের দশকে ১৯৯৬ সালে জাতীয় সমুদ্র বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত রিভিউ কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর ২০০০ সালে জাতীয় সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৫ সালের ৫ মার্চ তারিখে জাতীয় সংসদে "বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন-২০১৫" পাশ হয়। ফলে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম চালু হয়, যা দেশের সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি মাইলফলক অর্জন।

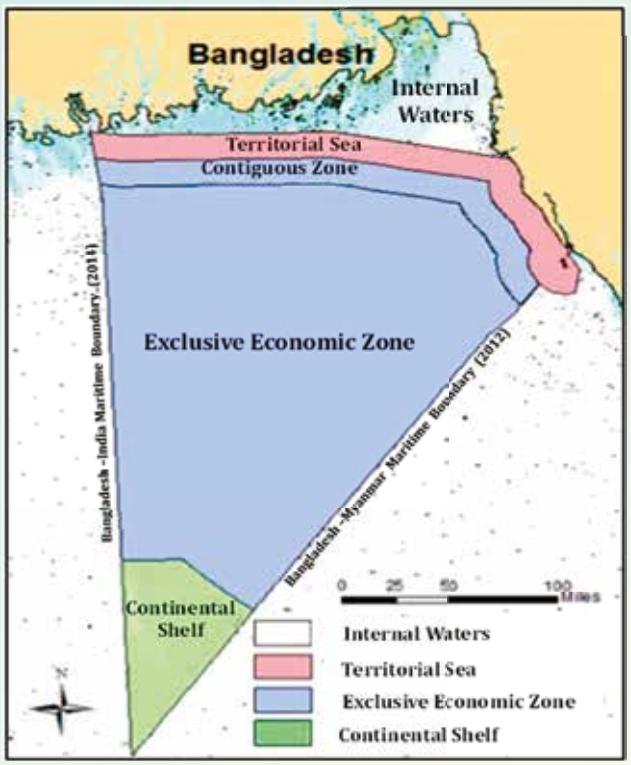

চিত্রঃ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহীসোপান এবং টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকা।

ব্লু-ইকোনমি (সুনীল অর্থনীতি) উন্নয়নে বাংলাদেশের সম্ভাবনা

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার বাংলাদেশকে যেমন দিতে পারে আগামী দিনের জ্বালানি নিরাপত্তা, তেমনি বদলে দিতে পারে সামগ্রিক অর্থনীতির চেহারা। এমনকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব।

- বঙ্গোপসাগর হতে প্রতি বছর ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরা হলেও ০.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরতে পারছি (কালের কণ্ঠ, ১ জুন ২০১৭)। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে মাছ আহরণ বাড়বে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০০ মিটারের অধিক গভীরতায় অতি পরিভ্রমণশীল মৎস্য প্রজাতি এবং গভীর সমুদ্রে টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্যের প্রাচুর্য রয়েছে।
- সামুদ্রিক বিভিন্ন জীব থেকে কসমেটিক, পুষ্টি, খাদ্য ও ঔষধ পাওয়া যায়। মেরিন শেলফিশ, ফিনফিশ ফার্মিং করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। সামুদ্রিক বিভিন্ন শৈবাল থেকে ইতিমধ্যেই Poly- unsaturated fatty acids (PUFAS)। যেমন omega-3 and omega-6 নামের antioxidants সমূহ বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে।

- মেরিন জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়। এছাড়া তৈল নিঃসরণ রোধেও জৈব প্রযুক্তি ভূমিকা রাখতে পারে।
- প্রতিবছর প্রায় ১৫ লাখ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে লবণ বিদেশে ও রপ্তানি করা সম্ভব।
- বঙ্গোপসাগরে ভারী খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারী খনিজের মধ্যে রয়েছে ইলমেনাইট, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, জিরকন, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট, কোবাল্টসহ অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এসব মূল্যবান সম্পদ সঠিক উপায়ে উত্তোলন করতে পারলে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।
- বিশ্ব বাণিজ্যের ৯০ ভাগই সম্পন্ন হয় সামুদ্রিক পরিবহনের মাধ্যমে। বিশাল অর্থনৈতিক এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য দ্রুত স্থানীয় জাহাজ তৈরির কোম্পানিগুলোকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করে আরো উন্নতমানের বাণিজ্য জাহাজ বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।
- গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি, বাংলাদেশের বন্দরে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের ফিডার পরিসেবা কার্যক্রম বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের বন্দরসমূহ কলম্ব, সিঙ্গাপুর বন্দরের মত আরো গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- দেশে ৩০০টি শিপ ইয়ার্ড ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বর্তমানে ছোট ও মধ্যম আকারের জাহাজ রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানি আয় বাড়ানোর জন্য জাহাজ তৈরির সক্ষমতা অর্জনের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশ দূষণ রোধে পর্যাপ্ত গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- সমুদ্র নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসের একটি বিশাল ভান্ডার। সমুদ্রের অফশোর অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকায়, সেখানে উইন্ড মিল স্থাপন করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি পাওয়া যেতে পারে।
- সমুদ্রের ওয়েব এবং জোয়ার-ভাটাকে ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এবং সমুদ্রের উপরের ও নিচের স্তরের তাপমাত্রার পার্থক্য থেকে Ocean Thermal Energy Convesion (OTEC) প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এজন্য গবেষণার পাশাপাশি প্রচুর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- সমুদ্র উপকূলীয় পর্যটন থেকে বিশ্বের জিডিপির ৫% আসে এবং বিশ্বের ৬-৭% মানুষের কর্মসংস্থান এই খাত থেকে হয়। বাংলাদেশে বিশ্বে সবচেয়ে বড় ১২০ কিমি দৈর্ঘ্যের অবিচ্ছিন্ন বালুময় সমুদ্র সৈকত রয়েছে। এক্ষেত্রে উপকূল অঞ্চলে পর্যাপ্ত বিনোদন ও মনোরম পরিবেশের ব্যবস্থা করতে পারলে এই খাত থেকে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে।

- সমুদ্র উপকূলীয় খনিজ বালি, খনিজ ধাতু উত্তোলন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের কোবাল্ট, কপার, জিংক এবং Rare Earth Element (REE) ধাতুসমূহের উৎপাদনের ১০ ভাগ আসবে সমুদ্র থেকে। বাংলাদেশ এই খাতে কোন ধরনের গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি বিধায় বঙ্গোপসাগরে এসকল মূল্যবান খনিজ ধাতু এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।
- ক্রুজ শিপের মাধ্যমে ভ্রমণের ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারলে পর্যটন খাত দেশের আয়ের প্রধান খাত হয়ে উঠবে।
- কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূমি বাড়ানো যায় এবং পরিপূর্ণ চর্চার মাধ্যমে পর্যটন খাত হিসেবে দ্বীপের উন্নয়ন ঘটানো যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমি অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ

বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের

স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সমুদ্র সম্পদের টেকসই শোষণ খুবই প্রয়োজনীয়। দারিদ্র্য বিমোচনে সামুদ্রিক সম্পদের ভূমিকা, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয়তা অর্জন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সীমাহীন। ব্লু-ইকোনমি অর্থনীতির একটি উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক খাত, বাংলাদেশের বর্তমান সামুদ্রিক সীমানার মধ্যে সমুদ্র ভিত্তিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের অভাবের কারণে বাংলাদেশে সামুদ্রিক সম্পদ উন্নয়নের অনেক সুযোগ অব্যবহৃত রয়ে গেছে। মন্ত্রণালয় বা বিভাগে জাতীয় নীতি পর্যায়ে যথাযথ নীতি ও দক্ষ ব্যক্তিদের অভাব বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমি অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উপকূলীয় মহাকাশ বাহিনী আমাদের

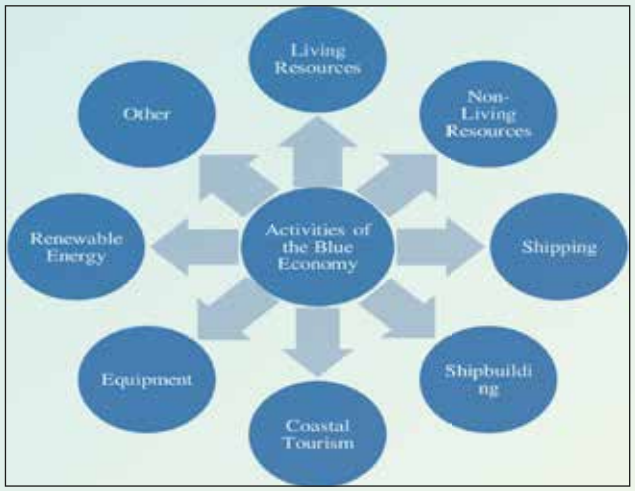

সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করবে এবং সমুদ্রের বাণিজ্যিক এলাকায় নিরাপত্তা বজায় রাখবে। আমাদের কোন শক্তিশালী মাস্টার প্ল্যান নেই যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে এবং অতিরিক্ত-আঞ্চলিক খেলোয়াড়দের টার্গেট করবে। কর্তৃপক্ষের উচিত প্রবাল ব্লিচিং, সমুদ্রের অ্যাসিডিফিকেশন, দূষণ থেকে জলের স্তর বৃদ্ধি সিস্টেম এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করা।

ব্লু-ইকোনমি থেকে সর্বাধিক সুবিধা নেওয়ার জন্য জ্ঞান, বিশেষজ্ঞ কর্মীবাহিনী এবং প্রযুক্তির অভাব, বিশেষত গভীর সমুদ্রের মাছ এবং সমুদ্রতলের সম্পদ শোষণের জন্য। সামুদ্রিক পর্যটনের জন্য সামুদ্রিক বন্ধুত্বপূর্ণ অবকাঠামো স্থাপন, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা। এলাকা, জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক ব্যবহার, ম্যানগ্রোভ এবং Sea-Grass রক্ষা, পরিবেশগত পরিবর্তন মোকাবেলা এবং কার্বন ডিসচার্জ ব্যবস্থাপনা ব্লু-ইকোনমি অর্থনীতির উন্নয়নে বাংলাদেশে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আন্তঃক্ষেত্রীয় সমন্বয় এবং উদ্যোক্তারা ব্লু-ইকোনমি অর্থনীতির পদ্ধতির অধীনে উপার্জন এবং অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য মূল প্রশাসক হবে। এখনও দেশটি মৎস্য ও Aquaculture, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙা, লবণ উৎপাদন এবং বন্দর সুবিধার মতো ব্লু-ইকোনমি অর্থনীতির খাতগুলির একটি ছোট পরিসংখ্যান আবিষ্কার করেছে। যাইহোক, এই সেক্টরগুলির বেশিরভাগই এখনও পুরানো পদ্ধতিতে কাজ করছে, তাই আরও সম্প্রসারণের জন্য উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রবর্তনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকন্তু, বড় অর্থনৈতিক সম্ভাবনাসহ আরও কিছু ব্লু-ইকোনমি সেক্টর, যেমন, সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মহাসাগরীয় শক্তি, ব্লু-ইকোনমি কার্বন, যেখানে বাংলাদেশের এক্সপোজার সীমিত বা অনুপস্থিত। উদ্ভাবন, দক্ষ ও দক্ষ জনবলের অভাবে সেই সম্ভাবনাময় খাতগুলো এখনো অস্পৃশ্য রয়ে গেছে। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ব্লু-ইকোনমি অর্থনীতি একটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে তবে এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি।

ব্লু-ইকোনমি উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

- পর্যাপ্ত নীতিমালার ও সঠিক কর্মপরিকল্পনার অভাব।
- দক্ষ জনশক্তির অভাব।
- প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।
- সম্পদের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব।
- মেরিন রিসোর্সভিত্তিক পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়া।
- ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যোগাযোগের অভাব।
- সমুদ্রে গমন এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গবেষণা জাহাজ না থাকা।

উপসংহার

ব্লু-ইকোনমি অর্থনীতির সুদূরপ্রসারী অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ সরকারকে নিতে হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্ত ও সঠিক পরিসংখ্যান করে বিনিয়োগকারীদের এই খাতে কীভাবে আকৃষ্ট করা যায় এবং এই খাতের কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। প্রযুক্তি নির্ভরতা ও দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ সম্পর্কে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানায় যেসব অনাবিষ্কৃত সমুদ্র সম্পদ আছে সেগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব সংগ্রহ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সেইসাথে ব্লু- ইকোনমিতে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও পরামর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে যা আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়া সমুদ্র বিষয়ে পরিকল্পনা, জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় ক্ষমতা বিকাশের জন্য নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া এবং সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও

উন্নয়নের জন্য কর্মপন্থা প্রণয়ন, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও সুবিধা বৃদ্ধি এবং পর্যটন ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে হবে। একই সাথে আন্তর্জাতিক সীমালংঘন আইন, সিসিআরএফ-এর ধারাগুলোর সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ছাড়া ব্লু-ইকোনমির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সকল ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ ও পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিবে ব্লু- ইকোনমি সমুদ্র অর্থনীতি।

তথ্যসূত্র

Alam, Khurshid. 2017. Ocean/Blue Economy for Bangladesh. Dhaka

Bangladesh eyes? blue economy? for sustainable growth, BDNEWS24 (2014).

Blue Economy? boon for Bangladesh: PM, South Asia Free Media Assoc. (2014).

"Blue Economy Concept Paper". 2012. The Rio + 20, United Nations Conference on Sustainable Development, Reode Janeiro, Brazil.

C. Costello, D. Ovando, T. Clavelle, C.K. Strauss, R. Hilborn, M.C. Melnychuk,T.A. Branch, S.D. Gaines, C.S. Szuwalski, R.B. Cabral, Global fishery prospects under contrasting management regimes, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113 (18) (2016) 5125–5129.

Chawdhury Dilruba and Mohamad Rokanuzzaman, "Blue Economy: Prospects & Challenges of Marine Fisheries of Bangladesh" (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2018) P.22

DoF (Department of Fisheries), National Fish Week, Compendium (In Bengali), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Government of Bangladesh, Dhaka, 2016.

FRSS (Fisheries Resources Survey System), Fisheries Statistical Report of Bangladesh, Fisheries Resources Survey System, Department of Fisheries, Bangladesh, 32, 57, 2016.

Hossain, M.S. (2001) Biological Aspects of the Coastal and Marine Environment of Bangladesh. Ocean & Coastal Management, 44, 261-282.

Islam, M.S. and T.H. Miah, 2000. "Economic Studz of Production, Financing and Marketing of Marine Fisheries in Bangladesh", Bureau of Socioeconomic Research and Training, Bangladesh Agricultural University.

K. Sherman, G. Hempel, The UNEP Large Marine Ecosystem Report: Aperspectiveon changing conditions in LMEs of the world's Regional Seas, 2008.

M. Barbesgaard, Blue growth: savior or ocean grabbing? J. Peasant Stud. (2017) 1–20.

MoFA, 2016. Press Release: Press Statement of the Hon'ble Foreign Minister on the Verdict of the Arbitral Tribunal/PCA (Dhaka).

MoFA (Ministry of Foreign Affairs), Press Release: Press statement of the Hon'ble Foreign Minister on the verdict of the Arbitral Tribunal/PCA. Dhaka, 08 July 2014.

L. Lei, Z.H. Zhang, L.L. Wang, Measurement and analysis on contribution rate of agricultural science and technology progress in Shaanxi province: based on C-D production function, Tech. Econ. 5 (2011) 51–63.

M.M. Rahman, Z.A. Chowdhury, M.N.U. Sada, Coastal resources management, policy and planning in Bangladesh, p. 689 - 756.

M. Shahadat Hossain, "Blue Economy in South East Bangladesh Major Opportunities and Constraints" IMSF, University of Chittagong.

M. Shamsuddoha, M.M. Islam. Bangladesh National Conservation Strategy: Coastal and Marine Resources. Department Forest and International Union for Conservation of Nature (2016).

Ninawe, A.S., 2017. Blue economy is the economic activities that directly or indirectly take place in the ocean and seas, use outputs, goods and services into ocean and land based activities. Examines Mar. Biol. Oceanogr. 1 EMBO.000501. 002017.

Planning Commission, Seventh Five-Year Plan (FY 2016 -FY 2020), General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Government of People's Republic of Bangladesh, 2015, pp. 283–291, 2016.

Pauli, G. A. 2010. The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. United State: Paradigm publications, 386.

Rashid, A. B., 2000, "An Economic Studz on Small Scale Marine Fishing in Bangladesh", Department of Agricultural Economics, Bangladesh Agricultural University (M.S. Dissertation).

R.M. Solow, Technical change and the aggregate production function, Rev. Econ. Stat. 39 (1957) 312–320.

S.A. Sethi, T.A. Branch, R. Watson, Global fishery development patterns are driven by profit but not trophic level, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107 (27) (2010) 12163–12167.

Sofiullah, M., 2001, "A Comparative Economic Studz of Industrial and Artisanal Marine Fishing in Bangladesh," Department of Agricultural Economics, Bangladesh Agricultural University (M.S. Dissertation).

X.H. Lin, Studz on the Contributions Rate of Marine Fisheries Scientific and Technological Progress in China, PHD thesis Shanghai Ocean University, 2017.

W.H. Ren, Q. Wang, J.Y. Ji, Research on China's marine economic growth pattern: an empirical analysis of China's eleven coastal regions, Mar. Policy 87 (2018) 158–166.

লেখক পরিচিতি: ড. সঞ্জয় বল, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

প্রবন্ধ

বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হযরত রসূলে করীম (সাঃ)

এস, এম, আশরাফুল হাবিব

খ্রিষ্টীয় ছয়শ শতাব্দী বিশ্বমানবের ইতিহাসের সর্বাধিক কলঙ্কময় কাল। তাই এ সময় আবির্ভাব ঘটেছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের। যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বা খাতিমুন নাবিয়্যীন, যিনি সর্বকালের জন্য প্রেরিত, যিনি সকল দেশের, সকল মানুষের জন্য তথা সমগ্র বিশ্বমানবের সর্বকালীন মুক্তি ও সামগ্রিক কল্যাণের মহাসনদ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক, যিনি সকল প্রগতির অগ্রদূত, যিনি বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব- কল্যাণের আহবায়ক, যিনি বিশ্বমানবের যাবতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান পেশ করেছেন।

"একমাত্র তিনিই সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দেন" বলেও ঘোষণা করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ইরশাদ হয়েছে:

'এবং (হে রসূল!) শুধু আপনি সরল-সঠিক পথের হিদায়ত করেন।'

যাঁর প্রতিটি কথা, কাজ এবং সমর্থন ও অনুমোদনের বিস্তারিত বিবরণ আজও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

যাঁর চরিত্র-মাধুর্যের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ইরশাদ হয়েছে :

'নিশ্চয় আপনি চরিত্র মাধুর্য্যের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।'

যাঁর প্রতি সমগ্র বিশ্বমানবকে গোমরাহির অন্ধকার থেকে হিদায়তের আলোর দিকে নিয়ে আসার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে :

'আলিফ, লাম, রা, এই কিতাব (কুরআনে হাকিম) (হে রসূল!) আপনার নিকট এ জন্য নাযিল করেছি, যেন আপনি গোমরাহির অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব জাতিকে হিদায়তের আলোর দিকে নিয়ে আসেন।'

যাঁকে আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির জন্য 'রহমত' বা 'শান্তি-দূত' বলে ঘোষণা করেছেন :

'এবং আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির জন্য শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।'

বস্তুত তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, তিনিই বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তিনিই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তিনিই বিশ্ব-শান্তির প্রত্যক্ষ প্রতীক।

তাই, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন :

'(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহ পাককে ভালবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন। এবং আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।"

অর্থাৎ জীবন সংগ্রামের সাফল্যের, জীবনাদর্শের সার্থকতার, তথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি লাভের একটিমাত্র পন্থাই রয়েছে, আর তা হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণ। কুরআনে হাকিমের ভাষায় এটিই হলো মানব- জীবনের চরম ও পরম সাফল্যের একমাত্র পন্থা এবং মানবজাতির চিরমুক্তির সহায়ক।

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এ কথাও ঘোষণা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক মহান দান। তাঁকে প্রেরণ করে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমানবতার বিরাট উপকার সাধন করেছেন। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানব জাতির একমাত্র আলোক-দিশারী, একমাত্র পথ প্রদর্শক। আখিরাতের কঠিন দিনে তিনিই শাফাআত করবেন সমগ্র মানবজাতির জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার এক মহান দান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু মানবজাতির জন্যই নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির জন্যই রহমত বলে ঘোষণা করেছেন। তথা আল্লাহ পাকই তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামিন খেতাবে ভূষিত করেছেন। অতএব তিনিই সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ। তিনিই বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, আর তাঁর আদর্শ যেমন একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ; তেমনিভাবে তাঁর আদর্শই সম্পূর্ণ এবং সার্বজনীন। মানবজীবনের সকল দিকের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। মানবজাতির সকল গোষ্ঠী, সমষ্টি এবং শ্রেণির জন্য তাঁর পূত-পবিত্র জীবনে রয়েছে এক মহান আদর্শ। এ পৃথিবীতে একই সাথে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ রয়েছে সাদা-কালো, ভাল-মন্দ, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, রাজা-প্রজা, বাদশাহ-ফকির, মালিক- শ্রমিক ও মনিব-চাকর প্রভৃতি।

এ সকল মানুষকে একই সাথে যিনি পথ প্রদর্শন করেন, যাঁর আদর্শ সকলের জন্য সমভাবে উপযোগী, সকল যুগের দাবী

পূরণ করতে সক্ষম, বাস্তবের অগ্নি-পরীক্ষায় যে আদর্শের পরিপূর্ণতা এবং যৌক্তিকতা শতবার প্রমাণিত হয়েছে, সে আদর্শই পেশ করেছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

- বস্তুত যদি আপনি শিশু হন, তবে মক্কার অদূরে হালিমা সাদিয়ার কোলে লালিত শিশু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যিনি একটি স্তনের দুধ পান করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, দ্বিতীয়টির প্রতি এ পবিত্র শিশুর লোলুপ দৃষ্টি নেই, কেননা এটি তাঁর দুধ-ভাইয়ের হক।
- যদি আপনি যুবক হন তবে মক্কার মেষপালক যুবকের জীবন-ইতিহাস পাঠ করুন।
- যদি আপনি ধনী হয়ে থাকেন, তবে মক্কার ব্যবসায়ী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর মহান স্বামী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করুন।
- যদি আপনি দরিদ্র হয়ে থাকেন, যদি দারিদ্র্যের কষাঘাতে আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত বলে মনে করেন, তবে সেই নবীর আদর্শ গ্রহণ করুন, যাঁর ঘরে দিনের পর দিন উনুনে ধোঁয়া দেখা যায়নি, যাঁর পেটে পাথর বাঁধা থাকতো। তাঁর জীবনসঙ্গিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন– 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেছে, অথচ তাঁর পরিবারবর্গ কোনদিন দু'বেলা এক সঙ্গে উদর পূর্ণ করে আহার করতে পারেননি।'
- যদি আপনি দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে দেখুন, মদিনায়ে মুনাওয়ারায় সুপ্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।
- যদি আপনি বিচারপতি হয়ে থাকেন, তবে মদিনার মসজিদে বসে যিনি বিচারকার্য সুসম্পন্ন করেছেন, সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করুন।
- আপনি যদি সেনানায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন, তবে দেখুন বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে যিনি সেনানায়ক ছিলেন, তাঁর মহান আদর্শ কি ছিল।
- যদি আপনি বিজয় লাভ করে থাকেন, তবে মক্কা- বিজয়ীর আদর্শ গ্রহণ করুন; যদি আপনাকে দুশমনের সাথে যুদ্ধ নয়, চুক্তি তথা সন্ধি করতে হয়, তবে ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে সন্ধি- চুক্তি সম্পাদনকারী নবীর আদর্শ গ্রহণ করুন।
- যদি আপনি শিক্ষক হয়ে থাকেন, তবে আমাদের নবীর সঙ্গী আসহাবে সুফফার শিক্ষকের আদর্শ আপনার জন্যে যথেষ্ট।
- যদি আপনি স্বামী হয়ে থাকেন, তবে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-র মহান স্বামীর আদর্শ গ্রহণ করুন।

- যদি আপনি পিতা, শ্বশুর অথবা নানা হয়ে থাকেন, তবে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর পিতা, হযরত আলী (রাঃ)-এর শ্বশুর এবং হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নানার আদর্শ অবশ্যই গ্রহণ করুন।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল পেশা ও অবস্থার লোকের জন্যে একমাত্র এবং সার্বজনীন আদর্শ হলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এ-কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সকল শ্রেণীর জন্যেই পেশ করেছেন তাঁর মহান আদর্শ, যাতে করে কোন শ্রেণিই তাঁর মহান আদর্শ থেকে বঞ্চিত না হয়।

যাঁর মহান দরবারে সাদা-কালোর কোনও ভেদাভেদ নেই; কৃষ্ণাঙ্গ হযরত বিলাল (রাঃ) এবং শ্বেতাঙ্গ হযরত উমর (রাঃ)-এর মর্যাদায় যে দরবারে কোন পার্থক্য নেই; সাম্য মৈত্রী-মমত্ববোধ এবং বিশ্ব-বোধ যে দরবারের বৈশিষ্ট্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ এবং ভাষা-নির্বিশেষে সকলে সমমর্যাদা লাভ করে যাঁর মাহফিলে, যাঁর আদর্শ পূর্ণ পরিণত, সর্বযুগোপযোগী, সর্বজনীন, চিরন্তন, মহান; যিনি মানবতার উৎকর্ষ সাধনের, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ অর্জনের নির্ভুল নীল নক্শা নিয়ে আগমন করেছেন। যিনি আল্লাহ্ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল; যাঁর অনুসরণেই রয়েছে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানের কামিয়াবির চাবিকাঠি। বিশ্ব-সভ্যতায় যাঁর অবদান সর্বাধিক; বিশ্ব-কল্যাণের প্রয়োজনেই তাঁর অনিন্দ-সুন্দর আদর্শের প্রচার, প্রসার এবং বাস্তবায়ন কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য, তিনিই বিশ্বমানবতায় সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আদর্শ।

লেখক পরিচিতি: এস, এম, আশরাফুল হাবিব, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।
মোবাইল: ০১৭২৪-৪৫৭৭৭৬

প্রবন্ধ

বেগম রোকেয়া : নারী মুক্তির অগ্রদূত

সানজিদা ফেরদৌস

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০–১৯৩২) বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যাঁর আবির্ভাব নারী মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে। অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের ভেতর থেকে তিনি কীভাবে এমন বিশ্বমানের আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন এবং সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটালেন তা বিস্ময়কর। সারা পৃথিবীতে তিনি নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত। এই অভিধা খুব সহজে অর্জিত হয়নি। জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁর মেধা ও শ্রমকে যেভাবে নারী উন্নয়নের কাজে ব্যয় করেছেন, সেই প্রচেষ্টা, সেই ত্যাগ তাঁকে এই অভিধা দিয়েছে।

মূলত: শৈশব ও কৈশোরে অবরুদ্ধ নারী জীবনের অভিজ্ঞতা এবং নারীর আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধিকারের চেতনা তাঁকে নারী জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রোকেয়া অবরুদ্ধ জীবনে থেকেও অনুভব করতে পেরেছিলেন, নারী উন্নয়ন, তথা নারী মুক্তি বা নারীর অধিকার নারীকে স্বপ্রণোদিতভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েই অর্জন করতে হবে। তিনিই প্রথম নারীকে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে চিন্তা করেছেন। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকারের দাবি উত্থাপন করার মধ্য দিয়ে তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি ছিলেন মহীয়সী নারীর আদর্শ প্রতীক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বাঙালি-মুসলমানের নবজাগরণের প্রাক্‌মুহূর্তে নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণে প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি, হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

বেগম রোকেয়ার জন্ম হয় ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তাঁর পিতা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের ছিলেন জমিদার। রোকেয়ারা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন। নিজের বাড়ির পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,-

> '...আমাদের এ অরণ্যবেষ্টিত বাড়ীর তুলনা কোথায়? সাড়ে তিন শত বিঘা লাখেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটী। বাড়ীর চতুর্দিকে ঘোর বন, তাহাতে বাঘ, শুকর, শৃগাল- সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, এজন্য আমাদের কাম-কাজ আটকায় না। ....আমাদের শৈশব জীবন পল্লী গ্রামের নিবিড় অরণ্যের পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।'[১]

একদিকে অবরোধ প্রথা, অন্যদিকে অশিক্ষা-উনিশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এই ছিলো বাঙালি মুসলমান নারীর নিয়তি। রোকেয়ার শৈশব কেটেছে যে পরিবেশে-

> 'সবেমাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকেও স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দা হইত। পুরুষদেরও অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি, –অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ীর কোনো লোক চক্ষুর ইশারা করিত, আমি যে, প্রাণভয়ে যত্রতত্র কখনও... রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনো কোনো চাকরানীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনো তক্তপোশের নিচে লুকাইতাম কোন সময় চোক্ষের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরুব্বিগণ, কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।'[২]

এমন অবরুদ্ধ পরিবেশে বেড়ে ওঠার পরও রোকেয়া পরবর্তীকালে তাঁর সারাটা জীবন অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছেন। এমন পরিবেশে প্রায় গোপনে, নি:শব্দে তিনি শিক্ষিত হতে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁর মনোলোক তৈরিতে যাঁরা অশেষ ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা হলেন– অগ্রজ ইব্রাহিম সাবের, অগ্রজা করিমুন্নেসা খানম আর বিবাহের পর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন। তাঁরা রোকেয়ার মননশীলতা এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি একইসঙ্গে হয়ে ওঠেন বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও কর্মী। তিন রূপেই তাঁর বিকাশ ঘটেছে। যে নারীশিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও নারী জাগরণের প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন, তার সকর্মক স্বাক্ষর তাঁর স্কুল ও তাঁর চিন্তাশীলতা-যার প্রকাশ তাঁর রচনাবলীতে বিধৃত।

বেগম রোকেয়া লেখিকা হিসেবে বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী; এমনকি চেতনাগত দিক থেকেও তিনি বিংশ শতাব্দীর সন্তান। বাঙালি, বাঙালি-মুসলমান, নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণ এই বিষয়গুলোকে ঘিরেই তাঁর ভাবনা আবর্তিত হয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা এগুলো তাঁর কর্মের পরিধি। এমনকি লেখিকা হিসেবে তিনি যেসব গল্প কবিতা, উপন্যাস রচনা করেছেন তার মধ্যেও যে ভাবনা প্রধান হয়ে উঠেছে তা হলো নারীজাগরণ।

নারী উন্নয়ন তথা নারী জাগরণ অর্থে রোকেয়া মূলত নারীর মানবীয় সত্তার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। যার জন্য প্রধান কাজ

হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষার প্রসার ও অবরোধ প্রথার অবসান। নারীর সামাজিক অবস্থান নিরূপণে বেগম রোকেয়ার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অনেক দূরদর্শী, তাঁর যুগের চেয়েও বেশি এগিয়ে। আজকের দিনে এসেও যেখানে আমরা নারীরা নিজেদের উন্নয়নের ব্যাপারে ততটা সচেতন নয়, যতটা বেগম রোকেয়া শতবর্ষ পূর্বে সক্রিয় ছিলেন নারীর শিক্ষা, নারীর অধিকার, নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজের উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়ন এবং নারী মুক্তির জন্য অবশ্যই নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেছেন-

> 'আমরা সমাজেরই অর্দ্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে- একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যতো তাহাই। শিশুর জন্য পিতা ও মাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে সর্বত্র আমরা যাহাতে তাহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক।'[৩]

নারীর স্বাধীনতা বলতে তিনি যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন–

> 'স্বাধীনতা অর্থ পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে, পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, লেডি জর্জ সবই হইব।'[৪]

শতবর্ষ পূর্বে তিনি যা চিন্তা করেছেন তার বাস্তবায়ন আমরা বর্তমানে আমাদের সমাজে দেখি। নারীরা আজ কেবল ঘরেই আবদ্ধ নয়; বাইরের কাজে অর্থাৎ জীবিকা অর্জনে সমানভাবে তৎপর। লেডি কেরানি, লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, লেডি জর্জ সবই দৃশ্যমান। নারীকে উপার্জনক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে বলেছেন বা যে যুক্তি দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে–

> 'আয় করিব না কেন? আমাদের কি হস্ত নেই, কদম নেই, না বুদ্ধি নেই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহস্থালী কার্যে ব্যবহার করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবস্থা করিতে পারিব না আমরা যদি পাতশাহী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে পতি দুর্লভ হয়েছে বলিয়ে কন্যাদের কেঁদে মৃত্যু কেন? কন্যাগুলোকে সুশিক্ষিত করিয়া কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও নিজের অন্ন, বস্ত্র নিজে আয় করুক।'[৫]

সমাজে নারীর যে অসহায় অবস্থা তার জন্য তিনি সমাজে যেমন দায়ী করেছেন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে, নারী পুরুষের মধ্যকার সামাজিক বৈষম্যকে, তেমনিভাবে দায়ী করেছেন নারীর অসচেতনতা, নিষ্ক্রিয়তা, দায়িত্বহীনতা ও মানসিক দৃঢ়তাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি 'স্ত্রীজাতির অবনতি' তে বলেন, 'সৃষ্টিকর্তা তাকেই সহায়তা করেন, যে নিজেকে নিজে সহায়তা করে। তাই বলে আমাদের অবস্থা আমরা গণ্য না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহা হইতে আমাদের ষোল আনা লাভ হইবে না।'

এভাবেই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিখুঁতভাবে খুটিয়ে নারীর দুর্বলতার প্রতিটি জায়গা দেখিয়েছেন এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায় বলে দিয়েছেন।

উনিশশতকে নবজাগরণের একটি শাখার নেতৃত্ব দিয়েছেন বেগম রোকেয়া। আধুনিককালের সূচনায় যখন নারীও মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হলো– শুধু নারী হিসেবে নয়, তার ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত হলো, তখন সামাজিক নাগপাশ থেকে তাকে মুক্তিদানের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। বাঙালি মুসলিম নারী তারপরও দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থেকেছে। এই অবস্থার মুক্তিদাত্রী বেগম রোকেয়া। চিন্তায়, চেতনায়, কর্মে, নারী জাগরণে তথা বাংলার নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা অসামান্য।

নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল দু'টি-

১. নারীশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা;

২. অবরোধ প্রথার অবসান।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনায় নারী মুক্তি তথা নারীর উন্নয়ন নিয়ে লিখেছেন। "মতিচূর" প্রথম খন্ডের সাতটি প্রবন্ধের পাঁচটিই নারী-বিষয়ক, যে প্রবন্ধগুচ্ছে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান, নারীর আত্মবোধের উন্মেষ সাধন–

> 'আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রকৃতি হইতে ক্রমে আমাদের স্বামী হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশ তাহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।'[৬]

মুসলমান সমাজের দৈন্যদশা ও পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হিসেবে রোকেয়া দায়ী করেছেন নারীশিক্ষার উদাসীনতাকে–

> 'মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্য।'[৭]

নারীকে পুরুষের সমকক্ষ হতে হলে প্রথমত তাকে শিক্ষিত হতে হবে। অশিক্ষার মতোই মুসলমান নারীকে অন্ধকারে রেখেছিলো সেদিনকার অবরোধ প্রথা। রোকেয়ার 'অবরোধ-বাসিনী' নামে প্রায় অর্ধশত নকশার সমবায়টি তাঁর এ বিষয়ে প্রতিবাদের অন্যতম উদাহরণ।

তিনি 'গৃহ' প্রবন্ধে নারীদের অন্তঃপুরের যে জীবনযাত্রা তা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। 'গৃহ' বলতে পুরুষ মনে করে এটা নিতান্তই তার, পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা আশ্রিতা। প্রকৃতপক্ষে, গৃহের অভ্যন্তরে নারীদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না–

> 'সাধারণত পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন গৃহখানা তার বাটি, পরিবারের অন্যান্য লোকেরা তার আশ্রিতা। বাড়ির মহিলারা কোনোকালে বাড়ির বাহিরে বের হন না, এই তাঁহাদের বংশগৌরব। কখনও ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কোন যানবাহনে আরোহণ করেন নাই।'[৮]

নারীদের এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বেগম রোকেয়া সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। নারীদের দৈন্যদশা থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব যেমন দিয়েছিলেন, তেমনি অবরোধ প্রথাকেও ভেঙ্গে সংস্কার করেছিলেন, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য নারীকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

বেগম রোকেয়া ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে "Sultana's Dream" রচনা করেন এবং ১৯০৮ খ্রি. তিনি সেটির বাংলা অনুবাদ করেন সুলতানার "স্বপ্ন" নামে। নারী মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, তার রূপায়ণ ঘটেছে এই উপন্যাসে। এখানে তিনি যে নারীকে কল্পনা করেছেন, সেই নারী সকল অর্থেই স্বাধীন, অবরোধ মুক্ত।

প্রায় সব রচনাতেই নারী মুক্তি ও নারী জাগরণ বিষয়ে লেখার কারণে অনেকেই তাঁকে পুরুষ-বিরোধী মনে করেন। কিন্তু তিনি আদৌ তা ছিলেন না। তিনি কখনোই নারী ও পুরুষকে একে অন্যের প্রতিপক্ষ ভাবেননি বরং যে বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তা হলো– সমাজের অগ্রগতির জন্য, উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই সাম্যবাদী অবস্থান আবশ্যক। নারী যেহেতু এই সমাজের অর্ধেক অংশ, তাই পুরো অর্ধেক অংশ ব্যতিরেকে সমাজের উন্নতি অসম্ভব। পুরুষকে বাদ দিয়ে নয়, বরং পুরুষের সাথে সাথে নিজের যোগ্যতা লাভের জন্য নারীকে আহ্বান জানান।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এমন বড় মাপের শিল্পী, সমসাময়িক বিবেচনায় তিনি যে চিন্তার প্রকাশ তাঁর লেখায় ঘটিয়েছেন তা আসলে অচিন্ত্যনীয়। তাই তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। তাঁর চিন্তার মধ্যে যেমন অসঙ্গতি ছিল, তেমনি বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতাও ছিল। যেমন কোনো সময় তিনি অবরোধের পক্ষ নিয়েছেন, আবার কোনো সময় অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তাঁর এই সীমাবদ্ধতা 'মূলত তাঁর যুগেরই সীমাবদ্ধতা'। তিনি যে সমাজে জন্মেছিলেন, যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, 'সেই অবস্থায় থেকেও এটা সত্য, তিনিই বাঙালি নারীদের মধ্যে প্রথম সত্যিকারের নারীবাদী ছিলেন'।

আজকের যে নারী সমাজ, শিক্ষায় নারীর উন্নতি তার সূচনা করে দিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। এদিক থেকে তিনি কেবল একটি কালের নয়, 'চিরকালের হয়ে উঠেছেন'।

সূত্র নির্দেশনা:

১. নার্স নেলী, মতিচুর ২
২. ২৩ সংখ্যক ঘটনা, অবরোধবাসিনী
৩. মতিচুর, প্রথম খন্ড, পৃ-১৭
৪. মতিচুর, প্রথম খণ্ড, পৃ-২১
৫. আলম, দিদারুল ও আলম অহিদুল (২০১৫) "নারী জাগরণের বিস্ময়কর প্রতিভা বেগম রোকেয়া", মহিয়সী ম্যাগাজিন, পৃ. ১০
৬. স্ত্রীজাতির অবনতি, মতিচুর ১
৭. বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, সওগাত, চৈত্র ১৩৩৩
৮. মতিচুর, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৫

অন্যান্য সহায়ক

** বেগম রোকেয়া -আব্দুল মান্নান সৈয়দ
** বেগম রোকেয়ার নারী উন্নয়ন ভাবনা : একটি পর্যালোচনা

লেখক পরিচিতি: সানজিদা ফেরদৌস, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মেহেরেপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

প্রবন্ধ

মীর মশাররফ হোসেন : প্রথম মুসলিম গদ্য শিল্পী

নিলুফার ইয়াসমিন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলিম গণজাগরণের শেষ কম্পিতশিখা, ওয়াহাবী আন্দোলনের মৃদুতম বিকাশকেও যখন বৃটিশ সরকার কঠোর হস্তে একেবারে নির্বাপিত ও নিশ্চিহ্ন করে মুসলিম চেতনার নিরানন্দ অন্ধকার যুগে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) এর আবির্ভাব। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে (১৮৬০) বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কর্তৃক রচিত গদ্যচর্চার তেমন কোনো নিদর্শন নেই। দোভাষী পুথির রুচি শাসিত বাঙালি মুসলমান সমাজে মীর মশাররফ হোসেনই প্রথম ও প্রধান সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর পূর্বে গদ্য ও কাব্য ধারায় মুসলিম সাহিত্যিকদের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে পুঁথির জীবনদৃষ্টি মধ্যযুগীয় অজ্ঞনতা, ধর্মভীতি এবং অলৌকিকতার প্রাধান্যমণ্ডিত। যেখানে পুঁথির প্রভাব পড়েছে সেখানেই এই অন্ধকার ছায়া ফেলেছে কিন্তু মীর মশাররফ হোসেন এই কূপমণ্ডুকতা থেকে বের হয়ে সাহিত্যকে নিয়ে গেছেন সৃষ্টিধর্মী শিল্পে। মীর মশাররফ হোসেন কেবল শ্রেষ্ঠ মুসলিম লেখক নন, বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তিনি অতিস্মরণীয় শিল্পস্রষ্টা। সাহিত্যের বহুমাত্রিক শাখায় ছিল তাঁর সরব পদচারণা।

মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম, লালন ও বেড়ে ওঠা কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া ও কুমারখালী। কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর এই তিন পূর্ববঙ্গীয় গ্রামাঞ্চলে মীর মশাররফ হোসেনের কৈশোরোত্তর সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে। কৃষ্ণনগর-কলকাতার সঙ্গে একবার সামান্য যোগাযোগ ঘটে বাল্য ও কৈশরে। সেই জীবনে ছিল সৎ সঙ্গের অভাব। নাগরিক জীবনের যে এলাকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতা সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও বোধকে আত্মসাৎ করে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মুখর ছিল মীর মানসের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরোক্ষ ও দূরাগত। তিনি জন্মসূত্রে বাঙালি মুসলিম, যে সমাজে তিনি বেড়ে উঠেছেন তিনি সেই সমাজের প্রতিনিধি। সেই সমাজের সীমাবদ্ধতা ও প্রাপ্তি উভয়ই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। এজন্য তাঁর লেখায় বাঙালি মুসলিম সমাজের স্বরূপটাই ফুঁটে উঠেছে। তাঁর রচনায় বিধৃত সমাজ মূলত ঊনিশ শতকের শেষার্ধের বাঙালি মুসলিম সমাজ। এই সমাজ প্রতিবেশ জীবন্ত হয়ে আছে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা-উদারতা, মালিন্য-ঔজ্জ্বল ও দীনতা সমৃদ্ধি নিয়ে।

মীর মশাররফ হোসেন খুব অল্প বয়সে সাহিত্য রচনা শুরু করেন। সমগ্রজীবনে নানা বিষয়ে তিনি প্রায় তিরিশখানা বই প্রকাশ করেছেন। বিপরীতধর্মী সরলতা ও জটিলতা, গতানুগতিকতা ও মৌলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা, গ্রাম্যতা ও নাগরিকতা, মধ্যযুগীয় ও আধুনিকতা সকলই মীরের স্বভাবজাত। তাঁর সম্পর্কে কাজী আব্দুল ওদুদ লিখেছেন, "অনেকের ধারণা মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' জংগনামা ও এ জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধু ভাষায় রূপান্তর মাত্র"। আবার বিষাদসিন্ধুরই এমন অনেক দিক ও অংশ আছে যা প্রমাণ করে যে মাইকেল- বঙ্কিমের শিল্পানুভূতিরও তিনি উত্তরাধিকারী। জগৎ ও জীবন ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে তার ধারণা যে অগভীর তা নয়। মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও যথেষ্ট।

সাহিত্যিক হিসেবে মীর মশাররফ হোসেন নির্লিপ্ত বা শিল্পী জীবনে নিঃসঙ্গ ছিলেন। এ বিষয়ে আব্দুল হাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মীর মশাররফ হোসেন সমাজ সচেতন খুবই ছিলেন কিন্তু কোনো রকম সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠান আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি থেকে শুরু করে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, ওয়াহাবী থেকে বঙ্গভঙ্গ কোনো কিছুই যে মীর মানুষকে আলোড়িত বা অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। আব্দুল হাই-এর মতে, মীর মশাররফ হোসেনের এই নিস্পৃহা মূলত: শৈল্পিক, তাঁর নিছক সাহিত্যপ্রীতি ও শিল্পানুরাগের ফল।

পারিবারিক বলয়ে পিতা মোয়াজ্জেম হোসেনের উদার মানসিকতা এবং বিপরীত প্রান্তে তার জমিদার সুলভ রক্ষণশীলতা এ দু'য়ের সম্মিলনে মীর মশাররফ হোসেনের শৈশব ও কৈশর অতিবাহিত হয়েছে। মীর পরিবারের আভিজাত্য প্রতিপত্তির চিত্র যেমন তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে তেমনি সংসারের নানা জটিলতা কুটিলতা মধ্যযুগীয় স্থূলতাও প্রবল হয়েছে। বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি তিনি ফারসিও শিখেছিলেন। এমনকি জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় শিখেছিলেন সরস্বতীব স্তব। এই বহুমূখী বিদ্যা তাকে পথভ্রষ্ট করেনি এমনকি লেখনির মধ্যেও কোনো অসঙ্গতি দেখা যায়নি। বরং দু'টোকে একাধারে গ্রহণ করে তিনি পেয়েছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার বীজমন্ত্র।

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাহিত্য সাধনায় মশাররফ হোসেনের জীবনবোধ ও সাহিত্য সাধনাকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণিতে বিভিক্ত করা যায়। তাঁর প্রথম বিয়ে ১৮৬৫ সালে। দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন ১৮৭৩ সালে। দাম্পত্য জীবনের বিশৃঙ্খলা ও অভিঘাতজনিত কারণ এবং এর নানাবিধ প্রভাব রয়েছে অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত গ্রন্থসমূহে। এ পর্যায়ে প্রকাশিত তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে রয়েছে 'রত্নবতী' (১৮৬৯), 'গড়াই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু' (১৮৭৩), 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) এবং 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩)। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৪ সাল অপেক্ষাকৃত সৃষ্টিহীন পর্ব। সপত্নীবাদের বিষয় চক্রান্তে পড়ে মীর পরিবারে শান্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরবর্তী

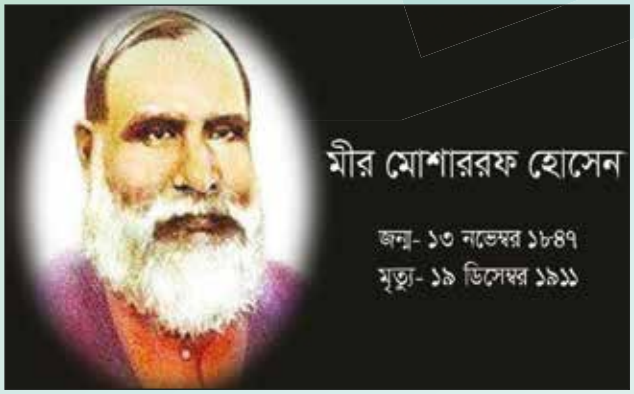

সময়ে দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন ভয়াবহ সংকটের মধ্যে নিপতিত হয়। সপত্নীদের বিষময় অভিঘাতে এ পর্যায়ে মীর তেমন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেননি; কেবল একটি প্রহসন 'এর উপায় কি' (১৮৭৫) ছাড়া।

মীর মশাররফ হোসেন ১৮৮৪ তে দেলদুয়ার আগমন করেন এবং ১৮৯২ তে নবম সন্তানের জন্মলাভ পর্যন্ত দেলদুয়ারে অবস্থান করেন। দাম্পত্য জীবনের সন্তানবহুল পর্বেই 'বিষাদসিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯২) ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) সৃষ্টি করেন। দেলদুয়ারে জমিদারি স্টেটের ম্যানেজার হিসেবে নানান জাতের লোকের নানারকম নগ্ন ও কুৎসিত মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন এবং অবশেষে ১৮৯২ তে দেলদুয়ারকে যমদ্বার জ্ঞানে ত্যাগ করেন।

১৮৯২ থেকে ১৯০২ এই দশ বছরে একমাত্র রচনা 'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯, প্রথম খন্ড)। এটি পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট মীর মানসের এক প্রতিশোধত্মক দপ্তর। ১৯০৩ থেকে ১৯১০ সাল রচনার সংখ্যাধিক্যে উর্বরতম। এই অন্তিম পর্বে মীর মশাররফ হোসেন শিল্পবিচারে অবসন্ন ও উদাসীন। মানবজীবনের রহস্য আর তাঁকে শিল্পানুপ্রেরণা যোগায়নি। ধর্মজীবনের গভীরতম উপলব্ধি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করেনি। এজন্য এ সময়ে রচনাগুলোতে কিছুটা অলৌকিকতা ও কিংবদন্তীপূর্ণ অসংস্কৃত পুঁথি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্বে তিনি রচনা করেছেন 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩), 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' (১৯০৩-১৯০৮), 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫), 'হযরত বেলালের জীবনী' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬), 'মোস্লেম বীরত্ব' (১৯০৭), 'বাজীমাৎ' (১৯০৮), 'বিবি কুলসুম' (১৯১০)।

মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠকীর্তি 'বিষাদসন্ধু'। এই উপন্যাসে মুসলমানদের অতীত গৌরবের ইতিহাস তথা কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) ও এজিদ সৈন্যদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিষাদময় কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটি ৩টি পর্বে ও ৬১টি পরিচ্ছদে বিভক্ত। পর্বগুলো হলো (ক) মহররম পর্ব (খ) উদ্ধার পর্ব (গ) এজিদ বধ পর্ব। মহররম পর্ব সবচেয়ে বড় পরিসরে লেখা। 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসটির বিষাদময় কাহিনি যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের হৃদয়ে বেদনার উৎস হয়ে থাকবে। 'উদাসিন পথিকের মনের কথা' তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। পারিবারিক কাহিনির পাশাপাশি নীলকর কেনি'র সাথে সুন্দরপুরের প্যারী সুন্দরী ও ভৈরববাবুর সংঘর্ষের কাহিনিও স্থাপিত হয়েছে এ উপন্যাসে। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' ব্যঙ্গরসে ভরা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। 'রত্নাবতী' উপন্যাসের কাহিনি রূপকথার মতো। গুজরাট নগরের রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের কল্পিত কাহিনি এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এটিকে আধুনিক উপন্যাস বলা চলে না, তবে এর বর্ণনাভঙ্গি একেবারে রীতিসিদ্ধ।

মশাররফ হোসেনের সাহিত্য প্রতিভার আরেক নিদর্শন 'বসন্তকুমারী' নাটক। এটি মুসলমান নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক। 'জমিদার দর্পণ' মীর মশাররফ হোসেন রচিত দ্বিতীয় নাটক। মুসলমান জমিদারের অত্যাচারের ভয়ংকর চিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর আরও দু'টি প্রহসনমূলক নাটক 'এর উপায় কি?' 'টালা অভিনয়'। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি ফুটে উঠেছে 'এর উপায় কি?' প্রহসনে। 'টালা অভিনয়' প্রহসনে লেখক হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মুখোশ উন্মোচন করেন। মীর মশাররফ হোসেন সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'গো জীবন' প্রবন্ধে লেখক হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নির্মূলের উপায় খোঁজার চেষ্টা করেছেন। 'আমার জীবনী' লেখকের আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ। জীবনের ঘটে যাওয়া নানা কাহিনি এই প্রবন্ধে সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। জীবন কাহিনি বর্ণনায় তিনি কোথাও নিজেকে বড় পরসরে মাপেননি। তাঁর ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি কাব্য-সাহিত্যেও তাঁর ছিল সরব পদচারণা। তাঁর কাব্যগুলো– 'গোরাই ব্রীজ বা গোরী সেতু', 'সঙ্গীত লহরী', 'পঞ্চনারী পদ্য', 'প্রেম পারিজাত' 'বিবি খোদেজার বিবাহ'। মীর মশাররফ হোসেনের সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁক ছিল প্রবল। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'আজিজন নাহার', 'কোহিনূর', 'হিতকরী'। শিশুতোষ গ্রন্থ রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা', 'বৃহৎ হীরকখনি'।

সুতারাং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা-সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব বাঙালি মুসলমান সমাজে আশীর্বাদ বয়ে আনে। তিনি বাঙালি মুসলিম রেঁনেসাসের সূচনা করেন। তাঁর লেখনি বাংলা-সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বহুদূর। মীর মশাররফ হোসেন একাধারে গদ্যশিল্পী, কথা সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক। এই বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম গদ্যশিল্পী হিসেবে সফল ও সার্থক।

তথ্যসূত্র:

১। মুনীর চৌধুরী: মীর-মানস।
২। মীর মশাররফ হোসেন: বিষাদ-সিন্ধু।

লেখক পরিচিতি: নিলুফার ইয়াসমিন, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মেহেরেপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ : আত্মলোকের আলোকদ্রষ্টা

মো: অনিক হাসান

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনন্য মনীষীর আবির্ভাব অতিপ্রাকৃত বলেই প্রতিভাত হয়, যাঁর অস্তিত্ব একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলে, একটি ভাষাকে মহিমামণ্ডিত করে, এবং মানবতার দিকে উন্মোচন করে এক চিরন্তন পথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাম, একটি সত্ত্বা, একটি মহাকাল। তিনি কেবল একজীবনে বহু জীবনের স্বপ্নবাহী নন, বরং চেতনার এমন এক আলোকবর্তিকা, যাঁর দীপ্তি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, শাশ্বত।

যে কবিতা শুধু পাঠের বিষয় নয়, বরং প্রতিটি শব্দে হৃদয়ের স্পন্দন জাগায়। যে গান কেবল শ্রুতিসুখ নয়, বরং আত্মার গভীরে ঢেউ তুলে চেতনায় মিশে যায় সেই সৃষ্টির নামই রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে শুধু পাঠ করা যায় না, তাঁকে অনুভব করতে হয়। তাঁর গান শোনার মধ্য দিয়ে নয়, তাঁর সুরের ধ্বনিময়তা হৃদয়ের রক্তধারায় বইয়ে নিয়ে যেতে হয়। তিনি এমন এক স্রষ্টা, যাঁর সৃষ্টি জীবনের আবরণ ভেদ করে অন্তর্জগতের সঙ্গে মিলে যায় তাঁর প্রতিটি পঙ্‌ক্তি আর প্রতিটি সুর আত্মার মৌন প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধ করেননি, আমাদের অস্তিত্বকে গভীরতর করে তুলেছেন। তাঁর লেখা আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হলেও, তা আদতে হয় হৃদয়ের ভাষ্য। সেই জন্যই বলা যায় রবীন্দ্রনাথকে পড়া যায়, শোনা যায়, চর্চা করা যায় তবু তাঁকে শেষ করা যায় না। কারণ তিনি একজন নন, তিনি এক অনুভব, এক চলমান সত্তা। তিনি কাব্যজগতের চিরবসন্ত যেখানে ভাষা ফুল হয়ে ফোটে, ভাবনারা মৌমাছির মতো গুঞ্জন তোলে, আর পাঠকের হৃদয় হয়ে ওঠে নন্দনকানন। তিনি সময়ের ঊর্ধ্বে, কালের সীমা ছাড়িয়ে হয়ে ওঠেন এক চিরকালীন অনুভব তা জীবনের, প্রেমের, যন্ত্রণার ও মুক্তির। তিনি এক অনন্ত জীবনচেতনা, এক প্রজ্ঞার প্রবাহ, যিনি শব্দের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন আত্মার নির্যাস। তাঁর কলমে যেমন গন্ধরাজের গন্ধ, তেমনি বেদনাহত প্রাণের দীর্ঘশ্বাসও। যে কবি নিজের সৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখেননি কেবল কাব্যের খাঁচায়, বরং তাকে বিস্তার দিয়েছেন নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, চিত্রকর্মে, সংগীতে ও দর্শনে। তিনি স্বয়ং সৃষ্টির সুরলোকে অনুপ্রবেশকারী এক যুগস্রষ্টা শিল্পী, যিনি সময়কে অতিক্রম করে হৃদয়ের মহাকাশে রচনা করেছেন তাঁর নিজস্ব ছায়াপথ। তিনি শুধু কবি নন, তিনি বাঙালির আত্মার মূর্ছনা। তাঁর প্রতিটি শব্দ শব্দের ঊর্ধ্বে গিয়ে এক ধরণের নীরব বর্ণনায় পৌঁছে দেয়, যেখানে শব্দ নয়, অনুভবই মুখ্য। তিনি চেয়েছিলেন,'যাহা কিছু মধুর, চির সুন্দর, চির সত্য, তাহার সঙ্গেই মানুষের হৃদয়ের মিলন হউক।' এই মিলনই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা, তাঁর কবিতার অন্তঃসার, তাঁর সংগীতের উৎসার।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ মে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম পথিকৃৎ। ঠাকুর পরিবারে সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক চর্চার পরিবেশ তাঁকে একটি বিস্তৃত মানবিক ও চিন্তাশীল মানস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কৈশোর থেকেই প্রশ্নবোধসম্পন্ন, সৌন্দর্যপিপাসু ও মানসিকভাবে স্বাধীনচেতা। কবিগুরুর জন্মের সময় ভারত উপনিবেশবাদী শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ, সমাজ ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতপাতের বিভাজন ও পশ্চাৎপদতার দ্বারা গ্রাসিত। এমন এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন মুক্তচিন্তার প্রতীক, সর্বজনীন চেতনার ধারক। তাঁর শিক্ষাজীবন প্রথাগত বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং স্বশিক্ষায়, বিশ্লেষণে, পর্যবেক্ষণে এবং বিশ্বসাহিত্যের সংস্পর্শে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক সত্যিকারের বিশ্বসত্তা। আলোকে আলো দিয়ে যাচা আর আলোতে মেলানো এই আলোকরূপী সত্ত্বা শুধু নিজের জীবনেই নয়, অসংখ্য মানুষকে আলোকিত করে চলেছেন বহুবর্ষ ধরে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজগৎ এক অবারিত মহাসমুদ্র, যার কূল-অকূল স্পর্শ করা দুরূহ। তিনি বাংলা ভাষাকে দিলেন এক নতুন দীপ্তি, এক গভীরতা, এক নবজাগরণ। তাঁর স্পর্শে বাংলা হলো মাধুর্যে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজগৎ একটি বিস্ময়কর মহাবিশ্ব। ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ১৪টি উপন্যাস, ৯৫টি ছোটগল্প, ৩৮টি নাটক ও নৃত্যনাট্য, ২৬টি প্রবন্ধসহ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন এবং ১৯১৫টি গান- এই বিপুল ভাণ্ডার কোনো সাধারণ মনীষার স্বাক্ষর নয়, বরং সৃষ্টিশীল অখণ্ড চেতনার মহা বিস্তার। আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর "অভিলাষ" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল তার প্রথম প্রকাশিত রচনা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "কবিকাহিনি" যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি মাত্র ১৬ বছরের তরুণ। পরবর্তী পাঁচ দশকে তিনি সৃষ্টি করেছেন হাজারো কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, চিত্রকর্ম যা বাংলা সাহিত্যকে এক বিশ্বমানের উচ্চতায় নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি নন, হয়ে উঠলেন বিশ্বসাহিত্যের বিশাল এক পর্বতশৃঙ্গ। ১৯১৩ সালে

যখন তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন, তখন তিনি শুধু ভারত বা বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেননি, তিনি ছিলেন সমগ্র এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী মনীষী। এই নোবেল শুধু একজন কবিকে নয়, এক মহাদেশের চেতনাকে, বাংলা ভাষার মহিমাকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে নৃত্যনাট্য ধারার প্রবর্তক। তিনি সংগীত, নাট্যকলা ও নৃত্যশৈলীর সম্মিলনে নির্মাণ করেন এক নতুন শিল্পরূপ নৃত্যনাট্য, যা একাধারে দৃশ্যমান শিল্প ও শ্রাব্য অভিজ্ঞান। তাঁর চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা ও শ্রাবণ-গাথা এই ধারার চারটি অনন্য সৃষ্টি, যেখানে গান, কবিতা, অভিনয় ও নৃত্য একসঙ্গে মিলে গড়ে তোলে এক অভিনব নাট্যরূপ। এই নৃত্যনাট্যগুলির মাধ্যমে তিনি শুধু চিত্রনাট্যই নির্মাণ করেননি, বরং মানবমনের দ্বন্দ্ব, প্রেম, আত্মসম্মান ও মুক্তির চিরন্তন প্রশ্নগুলিকে প্রাণবন্ত রূপ দিয়েছেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিরপরিচিত মানবিকতা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মার মুক্তির আহ্বান রেখে গেছেন। তাঁকে কখনো শুধু বাঙালির গর্ব বললে তা তাঁর যথার্থ সম্মান হয় না কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যদৃষ্টি, সংগীতবোধ, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যে গভীরতা, তা বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিকদের চেয়েও অনন্য এবং বিস্তৃত। তাঁর অনুবাদে ইউরোপিয় পাঠকের কাছে বাংলা কাব্যের দ্বার খুলে যায়। ইয়েটস, রোটেনস্টাইন, অঁদ্রে জিদ, রোম্যাঁ রোলাঁ, আইনস্টাইনের মতো বিশ্বের চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁর ছিল গাঢ় সম্পর্ক। তাঁর লেখার অনুবাদ রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও চীনের পাঠকদের প্রভাবিত করেছিল সেসময়েই। কবিগুরু হিসেবে তাঁর মর্যাদা কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত।

নারীমুক্তির প্রশ্নেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে নারীর আত্মপরিচয়, চিন্তা ও স্বাধীনতা প্রস্ফুটিত হয়েছে। চোখের বালি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, নষ্টনীড় প্রভৃতি রচনায় দেখা যায় নারীর অভ্যন্তরীণ জগৎ, সমাজের সঙ্গে তার সংঘর্ষ, ও আত্মমর্যাদার প্রসার। তিনি শুধু সাহিত্যেই নয়, বাস্তব জীবনেও নারীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিশ্বভারতীতে নারীদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়ে তিনি নারী-অধিকারের পথে বিপ্লব ঘটান। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক বিপুল মানবতাবাদী। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ ছিল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতর প্রকাশ।

১৯৩২ সালে পারস্যভ্রমণে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সফরের অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বিখ্যাত রচনায় "পারস্যযাত্রী"-তে। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩২ এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ এই দিনেই তিনি গিয়েছিলেন ফার্সি সুফিকবি হাফিজের সমাধিতে। সমাধিস্থলে পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথ এক অনন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। সমাধিরক্ষক হাফিজের লেখা একটি পুরোনো পাণ্ডুলিপি সামনে এনে দিলে, সেখানে উপস্থিত কয়েকজন ইরানি পণ্ডিত পাঠ করে শোনান। রবীন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগে তা শুনছিলেন। এরপর পরিবেশিত হয় একটি গজল যা হাফিজেরই লেখা। কবির ভাব, সুর ও রসে এমনভাবে ডুবে যান রবীন্দ্রনাথ, যেন তিনি সময়-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। ইরানি কবি মুক্তাদিরের লেখায় জানা যায়, সেদিন রবীন্দ্রনাথ এমন নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করছিলেন, যেন এক সিদ্ধপুরুষ ধ্যানস্থ অবস্থায় আত্মবিস্মৃত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হাফিজ, রুমি, শেখ সাদী, মীর্জা গালিব ও ইকবালের মতো সুফিসমৃদ্ধ দার্শনিক কবিদের একনিষ্ঠ অনুগামী। এইসব কবিদের কাব্য, শের, শায়েরী তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা, ভাব, রচনায় পাওয়া যায় এই প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া। তাঁর রচনার গভীরে যে আত্মিক ও বিশ্বমানবিক চেতনা কাজ করে, তা অনেকাংশেই এই সুফি কবিদের ভাবধারারই প্রতিফলন। হাফিজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের এক নিবিড় অনুভব। হাফিজকে ঘিরে তাঁর ছিল এক দুর্নিবার আবেগ, এক অন্তর্জাগতিক টান। শুধু কাব্যিক প্রশংসা নয়, হাফিজের ভাবজগতে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন আত্মার আশ্রয়, আত্মবিস্মৃতির আনন্দ। তিনি হাফিজে মুগ্ধ ছিলেন, নিমগ্ন ছিলেন, ভালোবেসেছিলেন পরম আত্মীয়ের মতো। হাফিজের কবরের পাশে বসে রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন, 'এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজন একই পান্থশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভর্তি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারেনি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল, আজ কত-শত বৎসর পরে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফিজের চিরকালের জানা লোক।' (পারস্যে)

একাধিক লেখায় ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইসলাম ধর্মের ভাবধারা, সংস্কৃতি ও মানবিক আদর্শের প্রতি গভীর আগ্রহ ও আন্তরিক অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'এমন সময়ে মুহাম্মদের আবির্ভাব হইল। সত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থুল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে সময়ে আরব সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসী সংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রী পরিত্যাগে কোনো বাধা ছিল না। তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্য পদবীতে আরোপন করিলেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চোখে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়িত ছিল না। এজন্য স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলো গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।' (প্রাচ্য সমাজ)

রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা ১৯৩৩ সালের ২৬শে নভেম্বর 'পয়গম্বর দিবস'-এর অনুষ্ঠানে পড়া হয়েছিল। পাঠ করেছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু। যেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন মীর্জা আলী আকবর খাঁ। যা ছিল- 'জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুগামীদের দায়িত্বও তাই বিপুল। ইসলামপন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্মবিশ্বাসের মহত্ব আর গভীরতা যেন তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার উপরও ছাপ রেখে যায়। আসলে এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুটি সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে না, সত্যদ্রষ্টাদের বাণীনিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা। সত্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালোবাসার পাত্র এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালোবেসে এসেছেন।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন, এ জগৎ কেবল বস্তুজগৎ নয় এটি এক আনন্দযজ্ঞ, এক চেতনাময় ঈশ্বরীয় লীলা। তিনি

বলছেন- 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হলো, ধন্য হলো মানবজীবন।' তাঁর দৃষ্টিতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এক বিশাল ক্যানভাস, যেখানে ঈশ্বর রঙ তুলিতে এঁকেছেন সত্য, সুন্দর ও আনন্দের ছবি। তাই তাঁর হৃদয় গেয়ে ওঠে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দরও।' গীতবিতানে তিনি উচ্চারণ করেন 'তোমার আমার মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা।' আবার রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ভাবনাগুলি যেমন গভীর, তেমনি বিশুদ্ধ ও সার্বজনীন। তাঁর কাছে ঈশ্বর শুধুই পূজনীয় এক পরম সত্ত্বা নন, বরং তিনি অভিজ্ঞতার, অনুধ্যানের, এবং আত্মার অন্তঃস্থ উপলব্ধির বিষয়। এই উপলব্ধির পথেই রবীন্দ্রনাথ আত্মসন্ধানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁর অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের নৈকট্য ও করুণা লাভের প্রত্যাশায়। এই সাধনার পথেই তিনি প্রভাবিত হয়েছেন সুফিবাদ দ্বারা। সুফি দর্শনের মতোই তাঁর চিন্তায় ঈশ্বর ও প্রেম একে অপরের সমার্থক। এই প্রভাব গভীরভাবে মেলে ধরেছেন রুমি, হাফিজ কিংবা ইকবালের লেখায়, যাঁদের ভাব ও রস রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক বিরল প্রতিভার মানুষ। তাঁর স্পর্শে সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, নাটক সবই যেন সোনা হয়ে উঠেছে। আজীবন তিনি ছিলেন হৃদয়ধর্মে পরিচালিত। তাঁর চিন্তা ও চেতনায় বাউলের সুর আর বাণী ধর্মের অন্তঃসারকেই যেন ফিরে পাওয়া যায়। পদ্মা-গড়াই বিধৌত শিলাইদহের নিভৃত পল্লী তাঁকে দিয়েছে আত্মসাধনার নির্জন পরিসর যা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে কবিতীর্থে। তিনি সাধনা করেছেন নিজেকে জানতে, আত্মাকে ছুঁতে। এই সাধনার মিশ্রণে এসেছে বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব পদাবলী, সুফিবাদ ও লালনের দর্শন। তাঁর কাছে মন ছিল আত্মিক উপলব্ধির মহা কেন্দ্রস্থল।

এবার আসা যাক কবিগুরুর শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর উপাসনা মন্দির বা উপাসনা গৃহের কথায়। শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহ শুধুমাত্র উপাসনার স্থান নয় এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মদর্শনের এক বাস্তব রূপ, যেখানে মিলনের, সহনশীলতার ও মানবিকতার বাণী গেয়ে ওঠে নীরবতা, আলো ও প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে। এই গৃহে কোনো মূর্তি নেই, নেই কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতার চিহ্ন। এখানে ধর্ম মানে বিভাজন নয় বরং মিলন, ঈশ্বর মানে কোনো একক ধর্মবিশেষের সত্ত্বা নয় বরং সর্বজনীন সত্য ও শুভবোধ। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহে বিভিন্ন ধর্মের মনীষীদের জন্মতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এটি এক ব্যতিক্রমধর্মী ও শিক্ষণীয় প্রথা। এই অনুষ্ঠানগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হলো সংশ্লিষ্ট ধর্মগুরু বা মনীষার রচনাবলি, বক্তৃতা কিংবা ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করা। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন স্তোত্র, গীতি ও শান্তিসঙ্গীত পরিবেশিত হয়, যেখানে সাম্যের বাণী ও আত্মিক উন্মোচনের আহ্বান থাকে। উপাসনা গৃহে শিক্ষার্থীরা ও আশ্রমবাসীরা সেই মনীষার জীবন ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা করে। শিক্ষকরাও ব্যাখ্যা দেন কীভাবে সেই মনীষার শিক্ষা মানবজাতির উন্নতির পথ দেখায়। অনুষ্ঠান শেষে কিছু সময়ের নীরবতা পালিত হয়, যাতে উপস্থিত সকলে অন্তর আত্মায় সেই মনীষার চেতনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতন তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা, মানবিক ঐক্য, এবং বিশ্বচেতনার বীজ বপন করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, সত্য ধর্ম মানুষের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম, যা কোনো ধর্মগ্রন্থ বা জাতিগত পরিচয়ের সীমায় বাঁধা পড়ে না। এই চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহ হয়ে ওঠে এক অনন্য উদাহরণ যেখানে ধর্ম মিলনের সেতু, সংঘর্ষের দেয়াল নয়। তিনি বলেছেন-'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান ,নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।'

রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, পশ্চিমা অনুকরণে গড়ে ওঠা কেবল পাঠ্যপুস্তকনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন করে তোলে। তাই তিনি চেয়েছিলেন এমন এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির কোলে মুক্ত পরিবেশে, গুরুকুল প্রথার আদলে শিক্ষা লাভ করবে যেখানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় নয়, বরং আত্মিক উন্নয়ন, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা এবং সার্বভৌম মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। এই ভাবনা থেকেই জন্ম নেয় শান্তিনিকেতনের প্রথম পাঠশালা, যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাকেন্দ্রকে রূপান্তরিত করেন "বিশ্বভারতী" নামে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরজাগতিক দর্শন, নৈতিক সৌন্দর্যবোধ এবং মানবতাবাদী চেতনার এক জীবন্ত প্রতিফলন। এখানে শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যার আহরণ নয়, বরং ছিল তা জীবন ও জগতের সঙ্গে গভীর আত্মিক সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর গণ্ডিকে অতিক্রম করে এই শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল প্রকৃতি, শিল্প, ভাষা ও দর্শনের নিঃশব্দ মেলবন্ধনে। বিশ্বভারতীর শ্রেণিকক্ষে চার দেওয়ালের কোনো শাসন নেই বরং খোলা আকাশ, সবুজ মাঠ, গাছের ছায়া, পাখির ডাক আর বাতাসের পরশ। এই অনাবদ্ধ পরিবেশেই শিক্ষার্থীরা মন উন্মুক্ত করে শেখে প্রকৃতি থেকে, গুরুর কাছ থেকে, এবং সর্বোপরি আত্মার গভীরতা থেকে। এটি 'আশ্রম শিক্ষা' যেখানে শিক্ষক হলেন পথপ্রদর্শক, আর শিক্ষার্থী হলো অনুসন্ধানী আত্মা। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি এক নতুন শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে শিশুরা খেলতে খেলতে শিখবে, গান গাইতে গাইতে বুঝবে প্রকৃতির নিয়ম, আর শিল্প, সংগীত, সাহিত্য হবে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই গান, নৃত্য, চিত্রকলা, নাটক সবকিছুই বিশ্বভারতীর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত। এখানে চিন্তার স্বাধীনতা অবারিত, প্রশ্নের স্বত্ব অবিনাশী। বিশ্বভারতীর শিক্ষা সর্বজনীন কেবল একটি বিশেষ জাতি, ধর্ম বা শ্রেণির জন্য নয়। এখানে একদিকে পাঠদান হয় সংস্কৃত, পালি, চীন, পারস্য, তিব্বতি, আরবি, ইংরেজি ভাষায় অন্যদিকে বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতির শিক্ষাও দেওয়া হয় পরিশীলিতভাবে। এই বহুভাষিক ও বহুজাতিক পাঠক্রমের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভারত ও বিশ্বের মৈত্রীর সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এখানে শিক্ষা আত্মিক অগ্রগতির এক অন্তর্জগৎ ভ্রমণ যেখানে অন্তরঙ্গতা, সাহচর্য, অনুভব ও উপলব্ধিই প্রকৃত মূল্যায়ন। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য একটি স্বপ্নময় মানুষ গড়ে তোলা, যে শুধুমাত্র পেশার জন্য নয়, বরং মানবতার জন্য নিজের জ্ঞানকে উৎসর্গ করতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শনে পূর্ববঙ্গ ছিল এক অনুপম সাধনক্ষেত্র, যেখানে জমিদারি পরিচয়ের আবরণ সরিয়ে তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন একজন জনসাধারণের বন্ধু,

প্রকৃতিপ্রেমী কবি এবং মানবমুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা রূপে। এই বাংলার নদী, মাঠ, মানুষ, বৃষ্টিমেঘে ঢাকা আকাশ আর খেজুর পাতার স্পন্দনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিল এক গভীর মানবিক তৃষ্ণা। শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসরের ঘরোয়া পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন এমন সব কালজয়ী সাহিত্য, যেগুলো বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে স্থায়ী জ্যোতির্ময়তা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক শুধু সাহিত্য, সমাজকল্যাণ কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর পারিবারিক জীবনেও পূর্ববঙ্গ ছিল গভীরভাবে সংযুক্ত। তাঁর আদি পৈতৃক নিবাস ছিল খুলনার ফুলতলা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে, যেখানে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা বসবাস করতেন। যদিও পরবর্তীকালে পরিবার কলকাতায় বসতি গড়ে তোলে, তবুও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। এছাড়াও, তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গেই, যা আরও একভাবে তাঁকে এই জনপদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে বেঁধে রাখে। এই আত্মীয়তা ও সাংস্কৃতিক অনুবর্তিতা তাঁর মনোজগতে পূর্ববঙ্গের একটি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ প্রতিচ্ছবি গড়ে তোলে। সম্ভবত এইজন্যই পূর্ববঙ্গে এসে তিনি নিজেকে শুধু একজন পর্যবেক্ষক নয়, বরং একজন আপনজন, একজন গৃহস্থ হিসেবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হিসেবে পূর্ববঙ্গে এসে যেমন প্রকৃতি ও জনজীবনের সংস্পর্শে নতুন ভাষা, ছন্দ ও ভাবনাকে আহ্বান জানাতে পেরেছেন, তেমনি এই অঞ্চলের কৃষক, শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম, সরলতা ও অন্তরাত্মার ভাষা তাঁর গল্প, কবিতা ও গানকে এক অনন্য গভীরতা দিয়েছে। পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি, ছুটি, ক্ষুধিত পাষাণ এই গল্পগুলোর নেপথ্যে রয়েছে শিলাইদহ ও পতিসরের অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রচলিত অর্থে জমিদার ছিলেন না। তিনি ছিলেন গরিব কৃষকদের বন্ধু, শ্রান্ত পথিকের আশ্রয়, জাগ্রত বিবেকের কান্ডারি। পতিসরে তিনি বিতরণ করেন, যাতে কৃষকরা উচ্চ সুদের ঋণ থেকে মুক্তি পায়। শাহজাদপুরে দান করেন প্রায় ১২০০ একর গোচারণভূমি, যা আজও তাঁর প্রগাঢ় মানবিক দায়বদ্ধতার নিদর্শন হয়ে আছে। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করেন, নিজ খরচে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করতেন, যাতে দরিদ্র

শিশুরাও শিক্ষার আলো পায় এইকাজগুলো কেবল এক আদর্শ জমিদারের নয়, একজন প্রকৃত সমাজসেবকের চিহ্ন। শিলাইদহের নদী, বটগাছ, নৌকার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কিংবা চাষিদের ক্লান্ত কণ্ঠ এইসবই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিকে আভিজাত্যের অলিন্দ থেকে টেনে এনেছিল মাটির গভীরে। তাঁর সাহিত্য পূর্ববাংলার নদীর ধারে, গাছপালার ছায়ায়, মানুষের মুখের অভিব্যক্তিতে জন্ম নিয়েছে। প্রাকৃতিক সান্নিধ্যে থেকেই তিনি লিখেছেন নৈবেদ্য, সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির সমবায় এক অন্তরতম জীবনদর্শনের রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে এসে এক নতুন শৈল্পিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মুক্তি শুধু অর্থনৈতিক নয়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিই প্রকৃত উন্নয়ন। এই কারণেই তিনি স্থানীয় সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে স্থানীয় নাটক, গান ও পালা-গানের প্রতি আগ্রহ দেখান। গ্রাম্য নারীদের শিক্ষায় সচেতনতা তৈরি করেন। পতিসরের নিজ আশ্রমে পাঠাগার স্থাপন করে পড়ালেখার মাধ্যমে চেতনা জাগাতে চেয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি, নদী, বর্ষা, কৃষক জীবনের গান এসবই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে গানের নতুন ধারায়। আমার সোনার বাংলা, ও আমার দেশের মাটি, এই গানগুলো পূর্ববঙ্গের ভাবধারায় গড়া। তাঁর সংগীতে বাংলার প্রকৃতি, জনপদের প্রেম, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি এবং লোকজ ঐতিহ্যের ছোঁয়া সব মিলিয়ে এক অনন্য বৈভব ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গভ্রমণ

ছিল শুধুই এক জমিদারির দায়িত্ব পালন নয়, ছিল এক মানবিক পূণর্জন্ম, যেখানে তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন বাংলার মাটি, জল ও জীবনের অন্তঃস্থলে। পূর্ববঙ্গ তাঁকে শুধু সাহিত্যিক রসদ দেয়নি, বরং তাঁকে এক মহৎ কর্মযোগে সম্পৃক্ত করে তুলেছিল। এখানকার প্রকৃতি ও সমাজজীবন তাঁর হৃদয়ের দিগন্তকে বিস্তৃত করে দিয়েছিল বিশ্বমানবতার দিকে। পূর্ববঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে যেমন আপন করে নিয়েছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথও পূর্ববঙ্গকে অমর করে তুলেছেন তাঁর শিল্পে, চিন্তায় ও কর্মে।

বাংলা সংগীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক মহাকাব্যিক চরিত্র যাঁর হাতে সংগীত হয়ে উঠেছিল কেবল কলারূপ নয়, আত্মার অভিব্যক্তি। তাঁর সৃষ্ট সংগীতধারা শুধুমাত্র সুরের বিন্যাস বা ছন্দের ছকে আবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল অন্তর্দর্শনের এক নিরবধি ধ্যান। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের রীতিনীতিকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন, তবে তার অনড় কাঠামোকে অতিক্রম করে সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন সংগীতভাষা, যা নিজস্বতায় দীপ্ত, মানবিকতায় সমৃদ্ধ, এবং চিরকালীন আধুনিকতায় মগ্ন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের প্রাচীন ভিত্তি থেকে অনেক উপাদান নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তা নিছক অনুকরণ নয়, বরং সৃজনশীল রূপান্তর। তিনি অলংকারের বাহুল্য, তানের জটিলতা বা বিস্তারের কৃত্রিম কৌশলকে পরিহার করে অনুভবের স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর গানে মীড়ের ব্যবহারে যেমন সুরের বক্রতা এসে যায়, তেমনি তাতে থেকে যায় মানবমনের কোমলতম অনুরণন। যেখানে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে সুরই একমাত্র অধিষ্ঠান, রবীন্দ্রনাথের গানে সেখানে শব্দ ও সুর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে তোলে এই দ্বৈত বিন্যাসই তার সংগীতকে দিয়েছে অনন্য মাত্রা। রবীন্দ্রনাথের সংগীত এক অর্থে আত্মজিজ্ঞাসার ভাষা। তাঁর গানে ভাব ও রূপের এই অভূতপূর্ব মেলবন্ধন কেবল সংগীতমাত্র নয় তা হয়ে ওঠে ধ্যান, এক ধরণের আত্মানুসন্ধান, এক নিরবিচ্ছিন্ন রূপান্তরের পথ। তার সংগীতকে উপলব্ধি করতে হলে ও কণ্ঠে ধারণ করতে হলে জানতে হয় তার গঠনের রীতি, রসায়ন, ও আধ্যাত্মিকতা। শুধু গলা তুলে গাওয়া নয়, আত্মা দিয়ে উপলব্ধির অনুশীলনও সেখানে জরুরি। তিনি ছিলেন বাংলার সংগীতজগতে প্রথম সেই বিপ্লবী, যিনি প্রচলিত ধারার পরিমিতিকে অতিক্রম করে গড়ে তুলেছিলেন এমন এক সংগীতরীতি, যেখানে ধ্রুপদী শৃঙ্খলা ও রোমান্টিক উন্মুক্ততা সমান গুরুত্বে সহাবস্থান করে। তাঁর গীতিকবিতা একদিকে গাম্ভীর্যবাহী, অন্যদিকে অনুভব নির্ভর। একদিকে ধ্রুপদী, অন্যদিকে আধুনিক। এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের সুনিপুণ সন্নিবেশে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠেছে চিরকালীন। পরবর্তীকালে বাংলা গানের বিস্ময়কর বিকাশে রবীন্দ্রনাথের সংগীত ছিল এক মৌন ভিত্তি। আজকের বাংলা আধুনিক গান, রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব ছাড়াও চিন্তাযোগ্য নয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলা সংগীত ঠিক কোন পথে যেত, সে প্রশ্ন আজও কল্পনার গভীরে অধরাই থেকে যায়। কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহ যে, রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টি না হলে বাংলা সংগীতের বিস্তার এত সংবেদ্য, এত পরিপক্ব ও এত বহুমাত্রিক হতো না। রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে পরিণত করেছিলেন এক অলৌকিক অভিযাত্রায় যেখানে মানুষের সীমিত সত্ত্বা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে চায় সেই অসীম, বিশ্বচেতন সত্ত্বার মধ্যে। তাঁর সংগীত তাই কেবল শিল্প নয়, এক আত্মিক অন্বেষা, এক মহাজাগতিক আরাধনার অর্ঘ্য। তাঁর সঙ্গীত কেবল সুর নয়, এ এক ধ্যান, এক রূপান্তরের প্রক্রিয়া যেখানে মানুষ নিজের সীমিত সত্ত্বা থেকে উঠে এসে মিলিয়ে যেতে চায় বিশ্বসত্তার অসীমতায়। তাঁর গান শ্রাবণের ঘন মেঘ, কখনো বিষাদের গহন আবেশে আচ্ছন্ন, কখনো আবার আনন্দের রৌদ্রচ্ছায়ায় দোল খায়। এই গান জীবনের প্রতিটি অনুভবকে এক অলৌকিক উচ্চতর অভিব্যক্তিতে রূপ দেয়

যেখানে প্রেম মানে শুধু মানব-মানবীর আকর্ষণ নয়, বরং সেই ঈশ্বরতুল্য আত্মার সন্ধান, যে আত্মা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে আছে অনন্তরূপে। রবীন্দ্রনাথের গানের অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিটি গানে এক ধরনের ধ্যানধর্মী নিরবতা কাজ করে যা চিৎকার করে না, বরং গভীরভাবে স্পর্শ করে হৃদয়ের অন্তঃস্থ অনুভবকে। তাঁর সৃষ্ট গীত এক গোপন আলাপ, যেখানে মানুষ ও পরম পুরুষ মুখোমুখি হয়ে কথা বলে মনের গভীরতম ভাষায়। রবীন্দ্রসংগীতের আরেকটি আশ্চর্য দিক হলো এর ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য। তিনি প্রেম পর্যায় থেকে শুরু করে প্রকৃতির গান, দেশাত্মবোধক গান, উৎসবের গান, ভক্তি ও আধ্যাত্মিক গান প্রতিটি শাখায় সুর ও ভাবের এমন নিপুণ সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যা বাংলা গানকে এক নবজাগরণ দিয়েছে। গানে তিনি শুধু নন্দনের রস জাগাননি, বরং সৃষ্টির গভীর অর্থও ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন "আমার সোনার বাংলা" এটি কেবল দেশপ্রেমের গান নয়, এটি এক মাতৃস্বরূপ দেশের সঙ্গে আত্মার বন্ধন রচনার নিদর্শন। তাঁর সুরসৃষ্টি ছিল এক ঐশী ধারা, যা পাশ্চাত্য, রাগসঙ্গীত, ভারতীয় ধ্রুপদী, বাউল, কীর্তন, ফোক এবং লালনের দার্শনিক সংগীতধারার মেলবন্ধনে এক নতুন ভাষা তৈরি করেছে। এ যেন এক বিশ্বসঙ্গীত, যেখানে আত্মা কোনো ধর্ম, জাতি বা বর্ণ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিটি শব্দ ধ্বনির অতীত এক নির্ভরতার আশ্রয়, এক প্রজ্ঞার ফসল। তাঁর গানে রয়েছে গ্রীষ্মের দহন, শরতের শুভ্রতা, বর্ষার মায়া, বসন্তের উচ্ছ্বাস। বাংলার প্রকৃতি যেভাবে বারো মাসে রঙ বদলায়, তেমনই বদলায় রবীন্দ্রনাথের সুরের অবয়ব। তাঁর গান প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধকেও জীবনের রসায়নে রূপান্তরিত করে তোলে। তাঁর গান নদীর মতো যেখানে দিক আছে, গতি আছে, কিন্তু বাঁধন নেই। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঙ্গীতিক শিল্পরূপ হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। একে রক্ষা করা সভ্যতার লক্ষণ। কারণ সভ্যতা হচ্ছে পুরনোকে অবিকৃতরূপে সংরক্ষণ করা। রবীন্দ্রসংগীত কোনো নির্দিষ্ট ঘরানায় আবদ্ধ নয়, এটি জীবনদর্শন, এক আত্মিক ঐতিহ্য, এক অস্তিত্বময় সংগীতদর্শন। এই গান আজও আমাদের একাকিত্বে সঙ্গ দেয়, আশাহীনতায় আশ্রয় দেয়, এবং বিশ্বাসহীন জগতে ভরসার মতো এসে বলে- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'

বিশ্বকবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক নক্ষত্র, যাঁর আলো নিভে যায়নি বরং সময়ের আবর্তে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি এক নীরব বিপ্লবী, যিনি অস্ত্রহীন হাতে জয় করেছেন মনুষ্যচেতনার দুর্গ। তিনি এক মহাজাগতিক কবি, যাঁর কবিতা কেবল কাগজে নয়, মানুষের আত্মায় অঙ্কিত। তাঁর সৃষ্টি এক অনন্ত রাগরাগিণীর মতো, যেখানে মূর্ছনা থামে না, বিরাম নেই, শুধু জেগে থাকে চিরজাগরণ। তাঁর জীবনচেতনা, সাহিত্যদর্শন ও সংগীতধারা একে একে আমাদের সামনে উন্মোচন করে এক আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজের স্বপ্ন।রবীন্দ্রনাথ কেবল এক ব্যক্তির নাম নয়, তিনি এক প্রবাহমান তত্ত্ব, এক চলমান উপলব্ধি, এক অনুভবযোগ্য শাশ্বত চেতনা। তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ কিংবা দর্শনের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি মানবতার অন্তঃস্থ গহ্বর থেকে উঠে আসা এক সূক্ষ্ম আলোর রেখা, যা আমাদের চালিত করে জ্ঞানের দিকে, সৌন্দর্যের দিকে, আর সর্বোপরি, আত্মোপলব্ধির দিকে। আজ যখন আমরা নৈতিক অবক্ষয়, মানসিক সংকট ও সাংস্কৃতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি, তখন রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন আমাদের একমাত্র আশ্রয়, এক আত্মিক পথপ্রদর্শক। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন "বিশ্বাস হারানো পাপ" এবং এই বিশ্বাসেই লুকিয়ে রয়েছে নবজাগরণের বীজ। তাঁর উপস্থিতি নেই, কিন্তু অনুভব আছে, তাঁর পদধ্বনি নেই, কিন্তু সুর আছে। আর সেই সুর আজও ধ্বনিত হয় প্রকৃতির মৌন স্পন্দনে, মানবহৃদয়ের অন্তঃশীল আর্তিতে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা দেন কীভাবে হৃদয়ের গভীরতম যন্ত্রণা থেকেও সৃষ্টির অনুপ্রেরণা আহরণ করতে হয়,কীভাবে জীবনকে দুঃখের মধ্যেও গীতময় করে তুলতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ কোনো একক সময়ের কবি নন, তিনি কালের যাত্রায় বারবার ফিরে আসেন, ফিরে আসবেন। তিনি বসে থাকেন আমাদের আত্মার অন্তঃপুরে চুপচাপ, গভীর, অথচ আলোকোজ্জ্বল এক সত্ত্বা হয়ে। যতদিন বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত এবং মনুষ্যত্ব থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি আলোকবর্তিকার মতো আমাদের পথ দেখাতে থাকবেন। আমরা যদি সত্যিই তাঁকে স্মরণ করতে চাই, তবে চর্চা করি তাঁর চিন্তা, তাঁর দর্শন, তাঁর সাহস। অপমান নয়, হিংসা নয় বরং মানবতার মর্মে তিনি আজও আমাদের প্রাসঙ্গিক, প্রগতিশীল, চির প্রিয়তম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অতীত নন, তিনি আমাদের আজকের, আমাদের আগামী দিনের চিরসাথী।

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ - ইকবাল ভূঁইয়া, প্রথমা প্রকাশন, বৈশাখ ১৪১৭।
২. পারস্যে রবীন্দ্রনাথ- আনিসুর রহমান স্বপন, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭
৩. রবীন্দ্রনাথ- সম্পাদনা ঃ আনিসুজ্জামান, ৩য় মুদ্রণ-২০১৮, অবসর প্রকাশনা সংস্থা।
৪. রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনঃ প্রমথনাথ বিশী, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশঃ আষাঢ়,১৩৫১।
৫. শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ- প্রথম আলো ,০৩ আগস্ট ২০১৮।
৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ, ওবায়দুল হাসান (বিচারপতি), প্রথম আলো, ০২ জুলাই,২০২১খ্রি.
৭. রবীন্দ্রনাথ মানসে মৃত্যু ভাবনাঃ বীরেন মুখার্জী, বাংলা ট্রিবিউন, ০৬ আগস্ট,২০২৩ খ্রি.
৮. বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০১৯ খ্রি.
৯. ভ্রমণ সাহিত্য (রবীন্দ্রনাথ), ভূমিকা ও সংকলনঃ মজিদ মাহমুদ, কথা প্রকাশ, ০৫ প্রকাশ-২০১৮খ্রি.
১০. tagore.web

লেখক পরিচিতি: মো: অনিক হাসান, ছাত্র, স্নাতক (পাস)
মেহেরপুর সরকারি কলেজ।

ছোটগল্প

ভালোবাসার কষ্ট

মো: হাবিবুর রহমান

আমার কথা শুনে ওরা না হেসে পারলো না। আমি যে কোন মেয়েকে ভালোবাসার কথা বলতে পারি বন্ধুমহল এটাকে রীতিমত চাপাবাজি বলে আখ্যায়িত করল। এমনকি কেউ কেউ চাপাবাজির নম্বর দিতেও বাদ রাখলো না। ছোট বেলা থেকেই তারা আমাকে মেয়ে ভীতু বলে জানতো। এর প্রমাণও তারা পেয়েছে বেশ কয়েক বার। আমার একটা সদগুণ ছিল যে অ-কারণে মিথ্যা বলতাম না। তাই বিষয়টাতে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হলো। এর ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। তাই শেষ পর্যন্ত সবাই আমার প্রকৃত বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বন্ধুদের হাসা-হাসিতে আমি বেশ অসস্তিবোধ করতে লাগলাম। তাতো হওয়ারই কথা কারণ আমি আনন্দ প্রকাশ করেই বিষয়টি বন্ধুমহলে বলেছিলাম। ঘটনাটি শোনার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছুটা কুণ্ঠিত হয়েই ঘটনাটি ওদরে বলতে আরম্ভ করলাম।

ঈদের ছুটিতে আমি যখন বাড়ি গিয়েছিলাম সেই সময় রীতা নামের মেয়েটি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। মেয়েটি আমাদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া।

বন্ধুরা সবাই যেন নিরীহ শিশুর মত আমার কাহিনি শুনতে লাগলো। এতক্ষণ যে হাসি তামাশা বন্ধুমহলে হচ্ছিল তার লেশমাত্র কারও চোখে-মুখে খুঁজে পাওয়া গেল না। এমনকি ঐ পাজি রাজুটারও না।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম পর্যায়ে রীতাকে যখন আমি দেখি তখনই তাঁর প্রতি আমার দুর্বলতা জন্মায়। কিন্তু লজ্জা ও ভয়ে আমি কোনদিন রীতাকে বিষয়টি জানায়নি। বন্ধুরা অনেকেই অনেক কথা বলত কিন্তু আমি কখনও আমার কোন গোপন কথা কাউকে বলতাম না কারণ আমি ছিলাম একটু চাপা স্বভাবের। অন্যরাও তেমন জানার আগ্রহ প্রকাশ করতো না। আমি বেশ কয়েকবার রীতাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি কিন্তু মনের কথা বলার সাহস পায়নি। শেষ পর্যন্ত ঈদের ছুটিই আমার সেই সুযোগ করে দিল। আমি যখন নিরব ঘরে গল্পের বই পড়ছিলাম ঠিক সেই সময় রীতাদের আগমন। আমি ভুলেও কল্পনা করতে পারেনি এই সময় তাঁদের আগমন হতে পারে। সবাই-কে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যখন আলাপচারিতা শুরু করলো তার কিছুক্ষণ পর কার যেন ডাকে রীতা ছাড়া অন্যরা ঘর হতে বের হয়ে গেল।

আমার অস্থিরতা বেড়ে গেল কিছু একটা বলার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জিত নয়নে বললাম– 'জানো একটি মেয়ের প্রতি আমার দূর্বলতা জন্মেছে।' রীতা কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বিছানায় রাখা শিউলি মালা বইটির পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলো। এক সময় আমি বলেই ফেললাম– 'আমার দূর্বলতার মেয়েটি আর কেউ নয় সেটা তুমি।'

রীতা যেন কথাটা শুনামাত্র আকাশ থেকে পড়লো। সে হয়তো ভাবতে পারেনি মামুন ভাই তার নামটি উচ্চারণ করবে। রীতা শুধু বললো– 'আপনি তো আমাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে জানেন।'

জীবনের অনেকগুলো গণ্ডি পার হয়ে এসে ভালবাসার ক্ষেত্রে যে প্রত্যাখ্যাত হবো সেটা কল্পনা করতে পারেনি। এই প্রথম আমি যখন রীতাকে আমার হৃদয়ের কথা প্রকাশ করলাম তখন আমি তার সন্তোষজনক উত্তর আশা করেছিলাম। ঠিক সেই সময় রীতার নিরবতা আমাকে যেন অসহায় করে তুললো। রীতা তার সিদ্ধান্তের কথা না জানিয়ে চলে গেলে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। কারণ হয়ত রীতা কথাগুলো ভালোভাবে গ্রহণ করেনি এমনকি অন্য কাউকে বলে দিলে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। আমি যেন স্থির হতে পারছিলাম না। সর্বদা রীতার নিরবতা আমাকে ব্যাকুল করে তুললো।

বেশ কয়েকদিন পর আমি যখন রীতাদের বাড়ি গেলাম তখন আমি ভুলেও রীতার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। অবশ্য রীতাও যেন আগের চেয়ে কেমন বদলে গেছে। হাসি-খুশি মুখটা সবসময় গম্ভীর দেখে আমার মন ডুকরে কেঁদে উঠলো। যে মুখে সদায় হাসি লেগে থাকতো সেটা যেন আমার জন্যই মলিন হয়ে গেছে। অগত্যা আমি ঠিক করলাম এখানে আর নয়, হয়তো আমাকে দেখেই রীতার হাসিটা মলিন হয়ে গেছে।

সকলের নিরবতা ভেঙ্গে হান্নান বললো– 'এমনওতো হতে পারে সেও তোকে ভালোবাসে। আমি বললাম- 'সে ভালোবাসেকি-না জানি না, কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি আজও।'

প্রায় মাসখানেক পর আমি রীতাদের বাসায় যায়। বিকেল বেলা বেতের চেয়ারে একাকি বসে আছি এমন সময় রীতা নাস্তা নিয়ে আসে। দু'জনে বেশ নিরব। চা পান করতে করতে আমি বললাম– 'জানো বেশ কয়েকদিন হতে ভাবছি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কিন্তু তুমি কথাটা কিভাবে নেবে তাই বলার সাহস পাচ্ছি না...'

রীতা বলে ভঙ্গীমা না করে বলে ফেলুন–

'তোমার প্রিয় ফুল কি?'

'হঠাৎ করে কারও প্রিয় ফুল জানার আগ্রহ হলো কেন বলুন তো?'

'না, এমনি জানতে ইচ্ছা করলো এই আর কি!'

রীতা বলে– 'কাউকে ফুল উপহার দেওয়ার কথা ভাবছেন না তো?'

'তেমন সৌভাগ্য আর হলো কই!'

'সৌভাগ্য শুধু শুধু হয় না করেও নিতে হয়।'

'তাই বুঝি?'

রীতা বলে– 'আমি যদি আমার প্রিয় ফুলের কথা না জানায় তাতে আপনার কি খুব অসুবিধা হবে?'

'না, তাতে আমার মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'না, আজ নয়, অন্য একদিন বলবো।'

রীতা বলে– 'আমার প্রিয় ফুলের নাম শুনবেন না?'

'তা আর বললে কই?'

'এত অল্পতেই যদি ভেঙ্গে পড়েন, তবে জানবার আগ্রহ কেন?'

'তুমি যেভাবে জেরা করা শুরু করলে তাতে ভেঙ্গে না পড়ে আর উপায় কি বলো?'

রীতা নিরবে বলে– 'রজনীগন্ধা।'

'বেশ ভালো ফুলই তো তোমার পছন্দ, গন্ধ ও সৌন্দর্য দু'টোই আছে ফুলে, আমার কিন্তু লাল গোলাপ।'

রীতা বলে– 'আপনারটা তো আমি জানতে চাইনি?'

আমি যেন কিছুটা অপমানিত বোধ করলাম, কারণ সহসা রীতা যে এমন কথা বলবে ভুলেও সেটা কল্পনা করাতে পারিনি।

অগত্যা মনের বিষ মনে মারতে হলো। মৃদুস্বরে বললাম– 'কারও ভালো লাগার মতো জিনিসের নাম জানাটা অন্যায় কিছু নয়? তাছাড়া আমার প্রিয় ফুলটা কি কাছের কাউকে জানিয়ে রাখাটা নিশ্চয় দোষের কিছু নয়?'

রীতা বলে– 'আমি আপনার কাছের বুঝলেন কি করে?' তবুও আমি আবারও লজ্জায় পড়ে গেলাম, কোন কথা বলতে পারলাম না। রীতা আর কোন কথা না বলে মিটমিট করে হাসতে লাগলো। তার এই হাসি অন্য কোন বার্তা বহন করে কি-না সেটা বুঝার ক্ষমতা আমার হয়ে উঠলো না। তবুও তার মনের বিশ্বাসকে আরেক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্য ফ্যাল ফ্যাল নয়নে রীতার দিকে চেয়ে রইলাম, রীতা সেটা ভুলেও টের পেল না। এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ কাটলে দু'জনের নিরবতা যেন ড্রইং রুমকে বেদনা বিধুর করে তুললো।

এমন সময় আমি নিরবতা ভেঙ্গে বলে উঠলাম– 'শিউলী মালা গল্পটি কেমন জানো?'

রীতা বলে– 'কেমন?'

নায়কের বিদায়ের ক্ষণে শিউলী তাকে বললো– 'আপনি এখান থেকে যাওয়ার পর কি করবেন?'

সে বলে– 'একটি শিউলী ফুলের মালা গেথে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিব।'

নায়ক বলে– 'তুমি কি করবে? তার প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি বলেছিল, আশ্বিনের পরে তো শিউলী ঝরেই যায়।'

আমি বলি– 'কথাটা সত্য।' রীতা তাতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

রীতা বলে– 'আপনিও কি কোন ফুলের মালা জলে ভাসিয়ে দিবেন না-কি?'

–'হ্যাঁ তাই মনে হয় করতে হবে। যে মালা পরাতে পারবো না সেটা না ভাসিয়ে উপায় কি?'

রীতা বলে– 'তাতে কিন্তু দুঃখ ছাড়া সুখ পাবেন না কোনদিন!'

–'দুঃখে যাদের জীবন গড়া সুখের আশা তারা কেমনে করে। তাছাড়া দুঃখ দিয়েই তো সুখের অনুভব করা যায়।'

-'তা করা যায় কিন্তু বিষণ্ন মন নিয়ে চলতে হয় সারাটা জীবন।'

-'সেই বিষণ্নতার মাঝে অন্তত আনন্দ পাওয়া যাবে এই ভেবে, ভালোবাসার কাঙ্গাল হতে হয়নি।'

আমি বললাম– 'কোথায় যেন পড়েছিলাম, "যে আশ্রয় যত জীর্ণ তাকে যতই আকড়ে ধরা যায় সে ততই ভাঙ্গতে থাকে"। তুমি যে তেমনি একটা আশ্রয় সেটা জানলাম।'

আমি আর কোন কথা না বাড়িয়ে বললাম– 'চলি, আবার দেখা হবে।'

রীতা কোন কথা না বলে নিরবে আমার প্রস্থানের দিকে চেয়ে রইল।

এর মাঝে অনেকদিন চলে গেছে। আমার পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হয়েছে। পড়াশোনার চাপ বেড়েছে তার উপর টিউশনিও আরেকটি পেয়েছি। টিউশনি থেকে মেসে ফিরে টেবিলের উপর একটি চিঠি দেখতে পেলাম। সহসা আমার মনের মাঝে বিষণ্নতার কালো মেঘ নেমে এলো। কয়েকদিন আগে বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে। বাড়িতে নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, কারণ দাদীর অসুস্থতার কথা আমার জানা ছিল। তা না হলে আবার চিঠি কেন? কিন্তু আমার সেই উদ্বেগ দূর হলো খামের উপরের লেখা দেখে কারণ হাতের লেখাটি অপরিচিত। তাই কৌতূহলভাবেই চিঠি পড়ার আগ্রহ বেড়ে গেল। কালবিলম্ব না করে খামটা ছিড়ে পড়তে লাগলাম–

মামুন ভাই,

আমার সালাম নিবেন। নিশ্চয় ভালো আছেন। সেটা আমারও কাম্য। কোনদিন আমার চিঠি পাবেন এমন আশা হয়ত আপনার ছিল না। কিন্তু সেটাও এখন বাস্তব। বহুদিন আপনি আমাকে আপনার মনের কথা বুঝাতে চেয়েছেন। জানি না আমাকে আপনি বুঝেছিলেন কি-না। তবুও আমি আজ এক প্রকার বিপদে পড়েই আপনাকে লিখলাম। আমি একটি কথা বিশ্বাস করি ভালো অনেককেই লাগতে পারে কিন্তু ভালো একজনকেই বাসা যায়। আমিও তেমনি একজনকেই ভালোবেসেছি। আশা করি এর পরেও আপনি অবুঝ রবেন না। আব্বা আমার বিয়ে ঠিক করেছে কিন্তু আমি সে বিয়েতে রাজি না। তবুও তাঁরা আমার কথা শুনছে না। আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জানি আপনি এখনও ছাত্র বটে, আব্বা-আম্মা আপনাকে মেনে নিবেন না। তবুও কিছু একটা করতে হলে সেটা আপনাকেই করতে হবে। আমার মতো চেষ্টা

আমি করেছি এবার আপনার পালা। যদি না পারেন তবে বিয়ের দিন অন্তত একবারের জন্য হলেও আসবেন। শেষ বারের মতো আপনাকে দু'চোখ ভরে দেখবো। আর আপনি দেখবেন আমার বধুবেশ। একটি কথা, একদিন আপনি আমার প্রিয় ফুলের নাম জানতে চেয়েছিলেন। বিয়ের পর আমার প্রিয় ফুল রজনীগন্ধার একটি মালা তৈরি করে ঘরে রেখে দিবেন। কোন সময় আমার কথা মনে হলে ওটাকে দেখবেন। চোখ ভরে জল আসছে আর লিখতে পারছি না। আপনার মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিলাম।

ইতি
আপনার রীতা

মেঘ যেমন সূর্যকে নিমিষে গ্রাস করে নেয় তেমনিভাবে আমার মনের মাঝে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। আমার কি করা উচিৎ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এখনও ছাত্র, কি করে একটি মেয়ের দায়িত্ব নিবো। আর পাশ করলেই যে চাকুরি পাব সেই নিশ্চয়তাই বা কে দিবে? হাজারও চিন্তা আমার মাথায় ভিড় জমাতে লাগলো। জীবনে যাকে ভালোবাসলাম তাকে যদি নিমিশেই হারাতে হয় তাতে দুঃখের বোঝা ভারী ছাড়া হালকা হওয়ার কোন রাস্তা দেখতে পেলাম না। এতদিনে বিয়ের আয়োজন করে ফেললো কি-না তাই বা কে জানে! আমি ঠিক করলাম বাড়ি হয়ে রীতাদের বাসায় যাব। সকালে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সমস্ত রাস্তায় রীতার মুখোচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তাঁর হাসি, উচ্ছলতা, রাগ, অভিমান এক এক করে সমস্ত বিষয় আমাকে তাড়া করতে লাগলো। সন্ধ্যার আগে বাড়ি পৌঁছলেও আমার মনের সন্ধ্যা যেন আর ফুরাতে চায় না। আমাকে দেখেই আমার মা বলে ফেললো– 'কি হয়েছে? তোর কেমন যেন মুখটা শুকনা শুকনা লাগছে! দুঃখকে কতক্ষণ হাসি দিয়ে ঢেকে রাখা যায়। তাই শেষ পর্যন্ত মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেতে হলো। মা আমাকে সান্তনা দিয়ে বলে– 'এটা প্রেম না বেটা, এটা হলো মৌহ। মানুষের মত মানুষ হতে পারলে তুই রীতার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে পাবি। এ বয়সে এমন হতেই পারে। তাছাড়া পরিবারের মধ্যে অশান্তি না করায় ভালো।'

এর মাঝে বাড়িতে যে বিয়ের দাওয়াত দিয়েছে সেটা বলতে মা বাদ রাখলো না। সময় বয়ে যায় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। মার অনুরোধে আমি কিছুই করতে পারলাম না। বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো।

বিয়ে বাড়ি সবাই ব্যস্ত। দাওয়াতি লোক হিসেবে আজ আমার আগমন। কেউ কারও খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না। আমি পায়ে পায়ে কনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার মন আজ বড় চঞ্চল। এক সময়ের জন্যও স্থির হতে পারছি না। এক নয়ন রীতাকে দেখার ব্যাকুলতা আমাকে তাড়া করে চলেছে। আর কে যেন বলছে একজন পুরুষ হয়ে একটি মেয়ের ভালোবাসাকে রক্ষা করতে পারলি না? ধিক্কার তোকে কেন এসেছিস করুণা দেখাতে? আমি কনের দিকে চাইতেই রীতার দু'চোখ পাথরে খোদাই করা চোখের মত ফ্যাল-ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল, আর পূর্ণিমার জোয়ারের মত দু'চোখ জল উছলে পড়তে লাগলো। আমি আর তাকাতে পারলাম না। আমার চোখে যেন বন্যার আবির্ভাব হতে যাচ্ছে সেটা কোন প্রকার বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা যাবে না। নিরুপাই হয়ে অপরাধীর মতো ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আমার সারা হৃদয়ে যেন মরুর ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। কখন যে শিলা বৃষ্টি নামে বলা যায় না!

সামনেই রীতার আম্মার সঙ্গে দেখা হতেই আমি সহসা বলে উঠলাম– 'ফুম্মা এত কম বয়সে রীতার বিয়ে দিয়ে দিলেন? আরও পড়াতে পারতেন!'

তিনি বললেন– 'আমার তো সেই ইচ্ছা ছিলো বাবা কিন্তু তোমার ফুপাকে কিছুতেই বুঝানো গেল না। তাছাড়া মেয়েকে তো ঘরে রাখা যায় না। বিয়ে তো দিতেই হতো। ভালো ছেলে পেয়ে গেলাম তাই আর দেরি করলাম না। এ যুগে ভালো ছেলে পাওয়া যে কেমন তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছো। শুনেছি জামাই মেয়েকে আরও পড়াবে। তুমি খেয়েছো বাবা?'

-'না, এখনও খায়নি।'

-'সেকি যাও যাও খেয়ে নাও। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, তোমার সঙ্গে অন্য আরেকদিন কথা বলবো।'

মামুনের মনে হলো তিনি মনে হয় আমার ভালোবাসার বিষয়টি অবগত হয়েছেন। কনেকে এখনই গাড়িতে উঠানো হবে। চারিদিকে কেমন যেন ব্যস্ততা আরও বেড়ে গেল। কয়েকটি মুখ ছাড়া বাকিগুলোতে আনন্দের ফোয়ারা। আমি শেষবারের মতো দেখার জন্য রীতার দিকে এগিয়ে গেলাম। রীতার দু'চোখে অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর আমার দিকে চোখ পড়তেই কান্নার রোল যেন বেড়ে গেল। কেউ বুঝলো না এই কান্না রীতার হৃদয়ে চেপে থাকা পাথর গললো কি-না। অসহায় রীতাকে আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠিয়ে বসানো হলো। বরযাত্রীরা জয়োধ্বনি দিয়ে চলতে শুরু করলো। আমি এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রীতার বিদায় দৃশ্য দেখতে লাগলাম। কখন যে তাঁর দু'চোখ দিয়ে বিষণ্নতার অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে সেটা বুঝে উঠার আগেই গাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেল। আমার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসলেও নিশ্চল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার এই গল্প শোনার পর বন্ধুদের সেই পূর্বের আনন্দ-উচ্ছ্বাস কোথায় হারিয়ে গেল। কারো মুখ থেকেই কোনো কথা বের হলো না। একজন বন্ধু সান্ত্বনার সুরে বললো– 'দুঃখ করিস না, জীবন এমনই। নদীর একদিক ভাঙে তো আরেক দিক গড়ে।' আড্ডা শেষে সবাই রুমের দিকে নীরবে রওনা দিলাম।

লেখক পরিচিতি: মো: হাবিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

ছোটগল্প

হাকিম ও হেকিম পাড়ার গল্প

মঈনুল ইসলাম

১.

মফস্বল জেলার একটি ব্যস্ততম আদালত প্রাঙ্গণ। প্রতিদিন এই আদালতের বারান্দায় হাজার হাজার মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে। কেউ আসে তার হকের সম্পত্তির মালিকানা ফিরে পেতে, কেউ আসে খুন-খারাবি, চুরি-দারি কিংবা কারো পকেট কেটে; মাজায় দড়ি বেঁধে। কেউ আসে হাঁটু পর্যন্ত কালো গাউন পরে, আইনের মার-প্যাঁচে নিজের পকেট ভারি করতে। কত বিচিত্র ধরণের মানুষের যে আনাগোনা এই আদালত চত্বরে তা বলে শেষ করা যাবে না। সৎ-অসৎ, দালাল, ঠকবাজ, প্রতারক, গুণ্ডা, রাজনীতিক, অরাজনীতিক বিভিন্ন মানুষের আসা-যাওয়ায় আদালত প্রাঙ্গণটি গমগম করে। আদালত প্রাঙ্গণের সামনেই একটি বিশাল তমালের গাছ অভ্যাগতদের দীর্ঘদিন ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। যে ছায়ায় বসে আগুন্তুকরা দেহটা শীতল করে। এক গ্লাস লেবুর শরবত কিম্বা এক গ্লাস টক ঘোল খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। এই তমালতলাতেই প্রতিদিন একটা মজমা বসে। মজমাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় এক-দেড়শো মানুষ। মজমার মাঝে লম্বাচুলওয়ালা লোকটি একটি বেতের ঝাঁপি খুলে দিতেই দু'টি গোখরো ফনা ধরে দাঁড়ায়। গোখরোর চেখে ও জিহ্বায় মানুষের চেয়েও বিষাক্ত প্রতিহিংসার আগুন। লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে আদালত পাড়ার সবাই চিনে, তাঁর নাম হারুন হেকিম। একটু আগেই মজমার পাশ দিয়ে পুলিশেরা তিনজন আসামিকে ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে নিয়ে গেল; সে আসামিদের চোখে-মুখে যে উৎকণ্ঠা, মুক্তির আকুলতা; তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত সাপ দু'টি। তারা এতোদিনে বুঝে গেছে বাকি জীবনটাও তাদের বেতের ঝাপিতেই কাটাতে হবে। তাই হারুন হেকিম যখন উত্থিত ফণার সামনে ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে ঘোরায়, তখনি সাপ দু'টি মুষ্টিতে ছোবল মারে, আর সাথে সাথে লোকটি মুষ্ঠিটি সরিয়ে নেয়। সাপের এই ব্যর্থ ছোবল দেখতে জনগণ পছন্দ করে। দর্শকের কারো মনেই কোনো ভয় বা শংকা নেই যে লোকটি সাপের ছোবলে মারা যেতে পারে। কিংবা ভাবে সাপের ছোবল হাতটা ছুয়ে গেলেও হেকিমের কিছুই হবে না! সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস হারুন হেকিমের কাছে যা শিকড়-বাকড় আছে তা খেলে সাপের কামড়ে কিচ্ছু হবে না। আদালতের ভেতরে আসামির বিচার চলে আর বাইরে সাপের খেলা চলে। কিছুক্ষণ আগে তিনজন আসামিকে পুলিশ টানতে টানতে নিয়ে গেল। বিজ্ঞ হাকিম সাহেব তাঁদের যাবৎজীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। দু'জন মহিলা উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে আসামি দু'টির পিছে পিছে চলেছে। এজলাসের ভিতরে হাকিম সাহেব বিচার করে আর এজলাসের বাইরে এই তমাল তলায় হেকিম সাহেব খেলা দেখায়। সে এক ভয়ঙ্কর খেলা, বিষাক্ত গোখরো সাপের সাথে মানুষের খেলা! কেউ না জানলেও অভিজ্ঞ হেকিম জানে এ খেলায় যখন তখন মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য তাঁকে খেলতে হয় এই ভয়ঙ্কর খেলা। এমনি ভয়ঙ্কর খেলাও মাঝে মাঝে এজলাসে বসে খেলেন বিজ্ঞ হাকিম। কোন কোন আসামির মৃত্যুর ফরমান জারি করে দেন। মানুষের মৃত্যুর ফরমান জারি করতে তাঁর কষ্ট হয়; কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন, দু'বেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যে তাঁকে এ-আদেশ জারি করতে হয়। জীবন বড়ই বিচিত্র সবাই একটি চক্রের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। সবাই চাই সুখে থাকতে, শান্তির দেখা পেতে।

ওই যে বৃদ্ধা আদালতের বারান্দায় বসে আছে, কিসের আশায়? কোন অমোঘ শক্তি তাকে বার বার টেনে নিয়ে আসে এই আদালত প্রাঙ্গণে। তাঁর বুকের গহীনে সঞ্চিত ভালোবাসা যার প্রতি সমর্পিত সেই একমাত্র আদরের ধনকে বদ্ধ গরাদে আটকে রেখেছে পুলিশ। এই ক'মাসে এ-গরিব বৃদ্ধাকে আদালত প্রাঙ্গণে যারা আসা-যাওয়া করে তারা প্রায় সকলে চিনে গেছে। বৃদ্ধা প্রায় প্রতি সপ্তাহে ছেলের জন্যে জামিনের আবেদন করে। উকিল সাহেব নিয়মিত টাকা নেয় কিন্তু ছেলের জামিন হয় না! বৃদ্ধা ব্যাকুল হয়ে যখন উকিল সাহেবকে জিজ্ঞেস করে– 'বাপ আমার ছেলের জামিন কেন হলো না? আমার ছেলে কবে ছাড়া পাবে?' উকিল সাহেব বৃদ্ধাকে বুঝিয়ে বলে– 'তোমার ছেলের কেস বড় জটিল; মাদকদ্রব্য সেবন ও চোরাচালানের মামলা। অত সহজে জামিন হবে না, তবে আমি খুব চেষ্টা করছি। আশা করি সামনের ডেটে জামিন হয়ে যাবে।' গ্রামের সহজ-সরল বৃদ্ধাকে বুঝিয়ে বিদায় করা একজন উকিলের পক্ষে কঠিন কোন কাজ নয়, কিন্তু স্নেহপরায়ণ একজন মা'কে বুঝাতে পারে এ বিদ্যা বাকপটু উকিল কোথায় পাবে? আদালত বন্ধ হয়ে গেলে বৃদ্ধা সবার শেষে আস্তে আস্তে বাড়ির পথ ধরে। আদালত প্রাঙ্গণের কেউ এই বৃদ্ধার নাম জানে না। তবে উকিল সাহেব জামিনের জন্য বার বার তাঁর ছেলের নাম ধরে ডাকাতে অনেকেই জেনে গেছে তাঁর ছেলের নাম সম্রাট। সম্রাটের উকিল তাঁর জামিনের আবেদন করলে সরকারি পিপি বাঁধা দিয়ে বলে– 'মাই লর্ড তাঁর নামই শুধু সম্রাট নয়। সে একজন কুখ্যাত মাদক সম্রাট। তাঁর জামিন হলে দেশ ও জাতির প্রভূত ক্ষতি হবে। আমি তাঁর জামিনের বিরোধিতা করছি।' সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে যায়। আর বৃদ্ধা মায়ের দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। বাবা-মায়ের একমাত্র পুত্র-সন্তান সম্রাট মাধ্যমিকে ভালো ছাত্র ছিল। কিন্তু সর্বনাশটা হলো শহরের

কলেজে ভর্তি হবার পরে। কিছু বন্ধুর পাল্লায় পড়ে প্রথমে সে সিগারেট খাওয়া ধরলো, তারপর গাজাঁ, গাঁজা থেকে থেকে ফেনসিডিল, এমনকি হেরোইন পর্যন্ত তাকে আসক্ত করে তুললো। শহরে মেসে থাকে, বাড়ি থেকে পড়া-লেখার নাম করে টাকা আনে আর নেশার রাজ্যে হারিয়ে যায়। দু'বছর পরে যখন এইচএসসি পরীক্ষার ফল বের হলো তাতে সে অকৃতকার্য হলো। যদিও তার চেয়ে মাধ্যমিকে খারাপ রেজাল্ট করা ছাত্ররা পাস করে গেল। গরীব মাতার মাথায় বাজ পড়লো কেননা তাঁর ছেলেকে ঘিরে স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়া। ছেলেকে জামিনে ব্যর্থ হয়ে বৃদ্ধা সেদিনের সেসব কথা ভাবতে ভাবেত বাড়ি পথে রওনা হলো।

২.

আজ রবিবার দু'দিন বাদে কোর্ট খুললো। রবিবারে কোর্টে মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। যে যার মতো ফাইল নিয়ে ছোটে। বাইরে তমালতলার মজমাটাও আজ বেশ জমে উঠেছে। হারুন কবিরাজ অনর্গল বকে চলেছেন আর বেতের ঝাপির মধ্যে থেকে দু'টো গোখরো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে ঘড়ির পেণ্ডলামের মতো এদিক-ওদিক দুলছে। মফস্বল শহর, তারপরও এই তমালতলায় নাগরিক জটিল জীবনের আঁচ লেগেছে; এখানে সবাই খুব ব্যস্ত আর মায়াহীন। মজমায় ওষুধের গুণগান গেয়ে ক্লান্ত হারুন কবিরাজ বসে পড়তেই মাইক হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরী মেয়েটি, সুমিষ্ট কণ্ঠে গেয়ে ওঠে লালনের ভাববাদী গান। যে গানের অর্থ সে হয়তো অনেক শ্রোতার মতো নিজেও জানে না। তবুও গেয়ে ফেরে হাটে-বন্দরে, শহরে-মফস্বলে, পাড়া-মহল্লার অলিতে গলিতে। মেয়েটি যখন দরদি গলায় গেয়ে ওঠে– 'মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষেরও সনে।' তখন তমাল গাছের ঘনছায়া ভরে যায় মানুষের ভিড়ে। উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরীর উত্থিত বুক ও বুকের নিচের নিরাবরণ কোমরের দিকে দৃষ্টি আটকে যায় সমবেত শ্রোতার। লাল-কালো চেকের তাঁতের শাড়ি ও হলুদ ব্লাউজ পরে মেয়েটি সমবেত শ্রোতার মাঝে হেলে-দুলে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। আলতা পরা নগ্ন শ্যামলরাঙা পা দু'টির প্রতি কারো কারো ঘন ঘন দৃষ্টি পড়ছে। মধ্যদুপুরে চৈত্রের দাবদাহে কিশোরী মেয়েটি যখন গান গেয়ে গেয়ে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তখন হারুন কবিরাজ মেয়েটিকে বিশ্রাম দিয়ে তাঁর ওষুধের ফাইল বের করছে এবং তার গুণকীর্তন করে দীর্ঘ একটা লেকচার সমবেত শ্রোতামণ্ডলীকে শুনিয়ে দিচ্ছে। বলাবাহুল্য তাঁর এই লেকচার এতোটাই রগরগে ও অশ্লীল যে বাপ-বেটা একসাথে দাঁড়িয়ে তা শোনার উপযোগী নয়। তবুও যৌন-ইঙ্গিতবাহী চটকদার এই বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা মজা পায়। শুধু মজা পায় তাই নয়, তারা এই সব বলবর্ধক ওষুধের গুণাগুণের উপর আস্থাও রাখে। অনেকেই কয়েক ফাইল কিনে বুক পকেটে রেখে মুচকিয়ে হাসে। ওষুধ বুকে নিয়ে ফেরার পথে কল্পনায় ভেসে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। হেকিম বলে আমি এরোপ্লেনের তলা ভেঙ্গে পড়িনি মিয়া। প্রতি রবি ও মঙ্গলবার আমাকে এই তমালতলায় পাবেন। দশ বছর ধরে এখানে বসছি।'

৩.

হঠাৎই আদালতের খাসকামরা থেকে লম্বা ডাক শোনা গেল খানসামার– 'মমিনউদ্দিন দিগর হাজির হন।' আদালতের লম্বা করিডর পেরিয়ে চারজন পুলিশ মমিনউদ্দিন ও তাঁর মা- বাবাকে বিচারকের এজলাসে হাজির করল। সবার হাতেই হ্যান্ডকাপ পরানো, মুখ শুষ্ক বিবর্ণ মলিন। সেই মলিন মুখাবয়াবে স্পষ্টতই উৎকণ্ঠার ছাপ। তাদের বিরুদ্ধে হত্যার চার্জসিট লাগানো হয়েছে। উইটনেসবক্সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মামলার বাদি মালার বড় ভাই আসাদ ও মামলার বিবাদি মালার স্বামী, শশুর ও শাশুড়ি। মালার হত্যাকাণ্ড এই জনপদে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। গোটা শহর জুড়ে হত্যকারীদের বিচারের জন্য মিছিল, মিটিং, মানববন্ধন, সভা-সমাবেশ হয়েছে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছেপেছে। যদিও শুরু থেকে মালার শশুরবাড়ির লোকেরা বলে এসেছে এটি একটি আত্মহত্যা; গায়ে কেরোসিন ঢেলে মালা নিজেই নিজেকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিবাদি পক্ষের উকিল উইটনেসবক্সে দাঁড়িয়ে থাকা আসাদকে প্রশ্ন করলেন– 'আপনারা কীভাবে নিশ্চিত হলেন আপনার বোনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে? আপনাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং সম্পূর্ণ মনগড়া। আপনি একটা শিক্ষিত, ভদ্র, সুশীল পরিবারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তাঁর কোনো কংক্রিট অ্যাভিডেন্স আপনাদের হাতে নেই।' উকিল সাহেব আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাদিপক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে অবজেকশন জানালেন। বাদিপক্ষের উকিল যখন সুযোগ পেলেন তিনি বললেন-'মাই লর্ড, আমাদের হাতে এই হত্যাকাণ্ডের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমরা একে একে সব প্রমাণই আদালতের সামনে হাজির করব।' দু'পক্ষের উকিলই ক্রসকোশ্চেনে অংশ নিয়ে সাক্ষীদের নাস্তানাবুদ করে তুললেন। বিচারক বারকয়েক ঘড়ির দিকে তাকালেন আর আদালত সেদিনের মতো মুলতবি করে নেমে গেলেন।

৪.

বৈশাখের তপ্তদুপর, রোদের আঁচ লেগে কালো রাস্তার পিচ গলে বাস-ট্রাকের টায়ারের সাথে উঠে যাচ্ছে। এতো তাপদাহ, এতো গরমও মানুষের কর্মব্যস্ততা ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। আদালত চত্বরে আজকে মানুষের সমাগম একটু বেশি, কেননা ঈদ উপলক্ষে আগামীকাল থেকে কোর্ট এক সপ্তাহের ছুটি। যাদের খুব প্রয়োজনীয় কাজ আছে তারা চেষ্টা করছেন কাজটি যেন আজই শেষ করা যায়। যাদের আত্মীয়- স্বজন হাজতে আছে তারা কয়েকদিন যাবৎ চেষ্টা তদ্‌বির করছেন যাতে করে তাদের প্রিয় মানুষগুলো সাথে নিয়ে ঈদ করতে পারেন। এই সুযোগে উকিল, মুহুরি, কর্মচারি, কর্মকর্তাগণ কিছু কামিয়ে নিচ্ছেন। কেননা তাদেরও তো একটু আনন্দের সাথে ঈদ করতে হবে? আর আনন্দ তো এমনি হয় না? খরচা আছে তাতে। আজ প্রচণ্ড তাপের মাঝেও আকাশের কোথাও কোথাও

মেঘ জমতে দেখা যাচ্ছে। বৈশাখ মাসের ভর দুপুরে কালবৈশাখী ঝড় উঠবে না কি? এমন সময় আদালত প্রাঙ্গণ কাঁপিয়ে বেশ কিছু মটরসাইকেল পরিবেষ্টিত হয়ে একটি কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পরে যিনি নামলেন তিনি একজন সাবেক সংসদ সদস্য। খুন, দুর্নীতিসহ উনার নামে বেশ কয়টি মামলাও ঝুলছে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে তিনি আদালতে প্রবেশ করলেন এবং দশ মিনিট পরে আরো বেশি স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে বীরদর্পে কোর্ট চত্বর থেকে কালোগ্লাস তোলা গাড়িতে করে বেরিয়ে গেলেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল, কতো জটিল মামলা, কতো সহজে জামিন হয়ে গেল।

৫.

ঈশান কোণে এতক্ষণ তীল তীল করে যে মেঘ জমে কালোরূপ ধারণ করেছিল তা রুদ্ররূপ ধারণ করলো। ঘনঘন বজ্রপাত আর শোঁ শোঁ ঝড়ের তাণ্ডবে ধূলি-বালিতে সব অন্ধকার হয়ে উঠল। বাইরে যারা বিক্ষিপ্তভাবে ছিল সকলে আদালতের নিচে গাড়ি পার্কিং-এর খোলা স্থানে সমবেত হলো। অনেক মক্কেল উকিলদের চেম্বারে জায়গা করে নিল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি আর বজ্রপাতে আলো কিছুটা কমে এসেছে। এই আলো আঁধারিতে দায়িত্বরত একজন কনস্টেবল দেখল আদালতের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি কুকুর একটি পা তুলে আদালতের দেয়ালে প্রাকৃতিক কাজ সারছে। পুলিশটি কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিতে গেলে কুকুরটি দৌঁড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। পিছন পিছন পুলিশটিও দৌঁড়ালো। অনেক ঘাম ঝরানোর পর কুকুরটিকে সে নিচে নামাতে সক্ষম হলো। কুকুরটিকে নামানোর সময় পুলিশটির একটি পা উঠে গেল একজন বৃদ্ধার পায়ের উপর। সে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বসে পড়ে বৃদ্ধার হাতে হাত দিয়ে দেখল বৃদ্ধার হাত সাপের গায়ের মতো শীতল। সে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখল বৃদ্ধা আর বেঁচে নেই। আস্তে আস্তে অনেকে এসে ভীড় জমাতে লাগল। অনেকে তাঁকে চিনতে পারলো। এ সেই বৃদ্ধা যে তাঁর ছেলে সম্রাটকে জামিন করতে মাসে অন্তত দু'বার আদালতে হাজিরা দেয়। সম্রাটের উকিল এসে দেখল তাঁর মক্কেলের মা কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পরে সটান শুয়ে আছে। চোখ দু'টো তার খোলা, সে চোখ এখনো ঘোলা হয়ে যায়নি। নিচের পাটির দাঁতগুলোও বেরিয়ে আছে। বৃদ্ধার চোখে ও দাঁতে কেমন যেন ব্যাঙ্গের ভ্রুকুটি লক্ষ্য করলেন উকিল সাহেব। বাইরে মাতাল হাওয়া আদালতের কাজ প্রায় বন্ধ। বিষণ্ন মনে উকিল গিয়ে সমস্ত খুলে বললেন বিচারককে। বিচারক সম্রাটের জামিন মঞ্জুর করলেন। ঝড় থেমে গেলে পৃথিবী শান্ত হলো। একটি আলগামনে চেপে সম্রাট তাঁর মায়ের লাশ নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে চললো। বিচারক ও উকিলেরাও বাড়ির পথ ধরলেন। আর সেই যে হারুন হেকিমের কথা বলেছিলাম, তাঁকে কয়েক সপ্তাহ থেকে এই আদালত পাড়ায় আর দেখা যায়নি। তবে মানুষের মুখে মুখে একটি কথা রটেছে যে হেকিম ব্যাটার বউ অন্যের হাত ধরে পালিয়েছে। তাই লজ্জায় সে আর এখানে আসে না।

লেখক পরিচিতি: গল্পকার, মঈনুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মেহেরেপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

ছোটগল্প

জলপাই গাছের ছায়ায়

মো: নাফিউল ইসলাম

১.

শ্যামল সবুজে ঘেরা এক জনপদ–কল্যাণপুর। চারদিক হাওড়ের ধারে ধারে গড়া গ্রাম, বর্ষায় যেখানে দিগন্তজোড়া জলরাশি আর শুষ্ক মৌসুমে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। সেই গ্রামের দক্ষিণ মাথায় একটা পুরনো জলপাই গাছ দাঁড়িয়ে আছে, নীরব, অথচ যেন সব কথা শোনে। সেই গাছের নিচে প্রতিদিন বিকেলবেলা বসে থাকতো তানিম। বয়স তখন দশ কি এগারো। পরনে ময়লা ধুতি আর ফাটা গেঞ্জি, চোখে কৌতূহলের ঝিলিক। হাতে পুরনো কাঠের খাতায় দাগ টানত–কখনও নিজের নাম, কখনও পাখির ছবি। তার মা রুজিনা খাতুন বলতেন, 'এই ছেলেটা অ্যামন জিনিস লিখে, বুঝিও না ঠিকমতো!'

তানিমের বাবা হারুন মিয়া ছিলেন পেশায় একজন কৃষক। সারা জীবন কাঁধে কোদাল তুলে ফসল ফলিয়েছেন, কিন্তু কখনোই দারিদ্র্য মুছে ফেলতে পারেননি। সংসারে ছিল দুই বোন, মা-বাবা আর তানিম, সে যেন ঘরের এক আশ্চর্য বাতিঘর।

তানিম পড়ত কল্যাণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিক্ষক কম, ক্লাস চলতো ইচ্ছেমতো। কিন্তু তানিম প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়েই স্কুলে যেত। খাতা ভর্তি করে লিখত, এমনকি যেদিন শিক্ষক আসতেন না, সেদিনও সে বন্ধুদের বোঝাত–'দ্যাখ, একদিন এই লেখাই আমাদের ঘর পাল্টাবে।'

পড়ার প্রতি তাঁর ছিল এক অদ্ভুত আকর্ষণ। পয়সা জোগাড় করে সে নিয়মিত বাজার থেকে পুরনো বই আনত। 'বই পড়া পাগল' বলেই চিনত অনেকে। একবার একটা পাণ্ডুলিপির মতো পুরনো গল্পের বই হাতে পেয়ে সে দু'দিনের মধ্যে পড়ে শেষ করেছিল। তাতে লেখা ছিল-'যে নিজের আলো খুঁজে পায়, সে অন্যের পথও আলোকিত করতে পারে।, বাক্যটি তখন থেকেই তাঁর মনে গেঁথে যায়।

তাঁর বন্ধু ইমন ছিল পুরো বিপরীত। সে বলতো, 'তুই এসব বই পড়ে কি করবি? মাঠে আয়, ফুটবল খেলি।'

তানিম হাসত, 'খেলব, কিন্তু আগে একটু পড়ি। একদিন এই বইগুলোই তোঁকে খেলার মাঠ করে দেবে।'

এভাবেই কেটেছিল শৈশব। বই, জলপাই গাছ, আর মায়ের হাতের পাতলা খিঁচুড়ি। কিন্তু শৈশবের শেষটা এলো দ্রুত! একদিন হঠাৎ স্ট্রোকে বাবার প্যারালাইসিস হয়ে গেল। সংসারের দায়িত্ব বাড়ে, স্কুলে অনিয়ম শুরু হয়। তবুও তানিম হার মানে না।

একদিন সন্ধ্যায় জলপাই গাছের নিচে সে তাঁর খাতায় লিখলো–

-'যদি আলো না পাই, তবে নিজেই আলো হবো।
যদি পথ না পাই, তবে নিজের পথ কেটে নেব।
কিন্তু থামব না। কারণ থেমে যাওয়া মানে মরে যাওয়া।
সেই রাতেই তার মাথায় জন্ম নেয় "আলোকপাঠ"।

২.

রাত গভীর। কল্যাণপুর তখন ঘুমিয়ে গেছে। কুয়াশার চাদরে ঢাকা মেঠোপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে তানিম, বুকে ধরা একটা পুরনো ব্যাগ। ভিতরে কিছু বই, কাগজ আর কয়েকটা পোস্টার–নিজ হাতে আঁকা। তাঁর চোখে কোনো ক্লান্তি নেই, শুধু উত্তেজনা। "আলোকপাঠ"–এই নামেই আগামীকাল যাত্রা শুরু করবে তার স্বপ্ন।

পরদিন বিকেলে স্কুলঘরের পিছনের পরিত্যক্ত কক্ষে পাঁচজন ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হয়। সবাই মিশ্র ভাবনায়, অনেকে জানেও না তাঁরা কী করতে এসেছে। ইমন বলল, 'তুই আসলেই পাগল, বই নিয়ে আবার ক্লাব হয় নাকি?'

তানিম মুচকি হাসে। –'তোর হাতে ব্যাট আছে, আমার হাতে বই। তুই যেমন মাঠে খেলিস, আমি খেলি মানুষের ভিতর আলো জ্বালিয়ে।' সবাই চুপ করে যায়। সেই দিন তারা প্রথম বসে, তানিম কবিতা পড়ে–কাজী নজরুলের "বিদ্রোহী"। মুগ্ধ হয়ে শোনে সবাই, এমন করে তো কেউ কখনও বই পড়ে শুনায়নি!

কিন্তু যত তানিম এগোয়, ততোই ছায়া ঘনায়। গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি, চেয়ারম্যান কাদির মিয়া খুব অসন্তুষ্ট।

-'এই ছেলেটা আবার কী শুরু করল? বড় হয়ে উঠলেই যে নেতা হইতে হবে?' তিনি ভয়ে ছিলেন, গ্রামের ছেলেমেয়েরা বই পড়া শুরু করলে একদিন প্রশ্ন করতে শিখবে। তানিমকে ডেকে বলেন, –'এইসব কাজ বন্ধ কর। বই পড়ে পেট চলে না।' তানিম চোখ নামিয়ে বলে,–'স্যার, পেটের জন্য আমরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি, কিন্তু আত্মা যদি অন্ধ থাকে, তাহলে মানুষটা মানুষ থাকে না।' এ কথা শোনার পর কাদির মিয়ার কপালে ভাঁজ পড়ে।

এই গ্রামের নুপুর–একজন সাহসী, নির্ভীক মেয়ে। দশম শ্রেণিতে পড়ে, সোজা কথা বলে। তাঁর মা বেঁচে নেই, বাবা বাজারে কাজ করেন। তানিমের ক্লাবে সে আসে প্রথম, হাতে পুরনো বই নিয়ে।

নুপুর বলে–'আমারও একটা স্বপ্ন আছে, আমি একদিন লেখক হবো।' তানিম তাকিয়ে বলে–'তুমি আসবে প্রতিদিন?' –'আমি আসব, কিন্তু একটা শর্তে।'

–'কি শর্ত?'

–'আমি শুধু শিখতে নয়, শেখাতেও চাই।'

তখনই তানিম বুঝে যায়, তাঁর একা পথ চলা আর একার নয়।

একসময় ক্লাবটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে স্কুলের মধ্যে। শিক্ষক আবদুল করিম স্যার একদিন ক্লাসে বলেন,–'তানিম, আমি তোমার কাজে গর্ববোধ করি। আমি নিজে তোমাদের একটা রুম ঠিক করে দিচ্ছি লাইব্রেরির জন্য।'

এ ছিল প্রথম অফিসিয়াল স্বীকৃতি। সেই পুরনো ঘরটাকে সাজানো হয় হাতে আঁকা ব্যানার, বইয়ের তাক, দেয়ালপত্রিকায়। একদিন স্থানীয় মাদকের ব্যবসায়ীরা রেগে গিয়ে ক্লাবঘরে হামলা করে। তারা চায় না ছেলেমেয়েরা সচেতন হোক, প্রশ্ন করুক। কিছু বই ছিঁড়ে ফেলে তারা। তানিম চুপচাপ দেখে, সবাই ভয় পায়।

পরদিন সকালে তানিম পুরো ঘর পরিষ্কার করে দেয়ালে বড় করে লেখে–'যদি অন্ধকার নামে, আমরা মশাল হবো।'

এই ঘটনা পুরো গ্রামে আলোড়ন তোলে। মানুষ আসতে থাকে, কাদির মিয়াও এবার নরম হয়ে আসে। একদিন তিনি

নিজেই বলেন, –'তুই ঠিক করছিস মনে হয়, বইয়ের আলোতে মানুষ বদলায়।'

৩.

"আলোকপাঠ"-এর হাত ধরে কল্যাণপুরের মাটিতে আলো ছড়াতে শুরু করে। এবার আর শুধু বই পড়া নয়, তানিম চাইছিল কিছু স্থায়ী পরিবর্তন। ভাবছিল, একটি সংগঠন গঠন করতে হবে, যেখানে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে যাবে একটাই বার্তা: 'নিজের ভাগ্য নিজে গড়ো, অন্যের হাত ধরে নয়, পাশে দাঁড়িয়ে।'

নুপুর, ইমন, স্কুলশিক্ষক করিম স্যারসহ ১২ জনকে নিয়ে গঠিত হলো নতুন সংগঠন–"তরুণ কল্যাণ সংঘ"।

সংগঠনের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট:

১. গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি কোচিং;

২. প্রতি মাসে একবার "পরিষ্কার গ্রাম, সবুজ গ্রাম" অভিযান;

৩. নারী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ;

৪. স্থানীয় শিল্প ও হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ;

৫. সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ : নাটক, কবিতা, গণনাট্য।

প্রথম কোচিং ক্লাস হলো একটি টিনশেড ঘরে। ব্ল্যাক বোর্ডটা ছিল ভাঙা, কিন্তু শিক্ষকদের চোখে ছিল দ্যুতি।

ইমন হেসে বলেছিল, –'এইখান থেকে যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়, তবে কাদির মিয়া নিজেই ক্লাব খুলে ফেলবে!'

সেই বছরেই সংঘ আয়োজন করে "আলোর উৎসব"। সেখানে নুপুর লিখেছিল একটি নাটক–'আঁধারে জন্ম, আলোয় ফেরা'। নাটকে গ্রামের এক দরিদ্র মেয়ের সংগ্রাম দেখানো হয়, যাকে মাদক ও বাল্যবিবাহের ভয় ঘিরে ধরে, কিন্তু সে পড়ালেখা চালিয়ে যায়। নুপুর নিজেই মঞ্চে ওঠে, কাঁপা কাঁপা গলায় সংলাপ বলে-

'আমার কলমই আমার মুক্তির চাবি। কেউ তা ভেঙে ফেলতে পারবে না।'

সেই দৃশ্য দেখে অনেক মা তাদের মেয়েদের নিয়ে আসে ক্লাবে, বলেছিল–'আমার মেয়েটাকেও শেখাও।'

এরপর একদিন জেলার স্থানীয় পত্রিকা "সাপ্তাহিক দিগন্ত" তাঁদের নিয়ে একটি প্রতিবেদন করে। শিরোনাম: 'গ্রামের আলো জ্বালাচ্ছে এক তরুণ–তানিম হোসেন'। সেই সপ্তাহেই জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ফোন আসে।

তানিমকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ঢাকায়–জাতীয় যুব উদ্যোক্তা সম্মেলনে। এদিকে সংগঠনের কাজ করতে করতে তানিম আর নুপুর অনেক কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু তারা জানত– এ সম্পর্ক হবে দায়িত্বের উপর দাঁড়িয়ে, আবেগের উপর নয়। এক সন্ধ্যায় নুপুর বলে,–'তুই ঢাকায় চলে যাস। তুই বড় হবি। আমি থাকব এখানেই।,

–'কিন্তু তুই আমার পাশে না থাকলে...'

–'তুই যা করছিস, তোর পাশে তো তোর স্বপ্ন আছে। আমি থাকলে সে স্বপ্ন হয়তো মরে যাবে।'

নুপুরের চোখে জল। তানিম তখন বুঝে যায়, ভালোবাসা মানে কখনও কখনও আলাদা হয়ে দাঁড়ানো, যাতে আরেকজন উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারে। যাত্রার আগেরদিন সে আবার যায় জলপাই গাছের নিচে। হাত রাখে গাছের কাণ্ডে, বলে,-'তুই ছিলি আমার প্রথম শ্রোতা। এবার আমি যা শিখব, তা নিয়েই ফিরব।' পরদিন ট্রেনে ওঠে সে। পকেটে একটা চিঠি–নুপুর লিখে দিয়েছে: 'তুই ফিরে আয়। তুই শহরের আলোয় গিয়ে গ্রামের অন্ধকার ভুলে যাস না।'

৪.

ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে যখন ট্রেন ঢোকে, তখন আকাশে রোদ ঝলমলে। কিন্তু তানিমের চোখে অচেনা আলো। এত মানুষ, এত গাড়ি, এত দৌড়–কেউ কারও দিকে তাকায় না, কেউ কারও নাম জানে না।

তার বুকের পকেটে মোড়ানো চিঠিটা–নুপুরের লেখা, প্রতিটি শব্দ যেন ঢাকার কোলাহলের মাঝেও একটুকরো নীরব গ্রাম। যুব উদ্যোক্তা সম্মেলনে তানিমকে বক্তা হিসেবে ডাকা হয়। সভা কক্ষে সারি সারি চেয়ার, সামনে বড় ব্যানার–

"স্বপ্নের পথিকেরা : কেমন হবে আগামীর বাংলাদেশে" তানিম দাঁড়িয়ে, মাইকে প্রথম বলে–

'আমি এসেছি এক হালি বই আর একঝাঁক চোখে স্বপ্ন নিয়ে। আমার পেছনে একটি গ্রাম আছে, সামনে শুধু পথ। আমি কোনো মহান সন্তান নই, আমি সেই সন্তান, যাঁকে অন্ধকারে ঠেলে দিলে সে মশাল বানিয়ে ফিরে আসে।'

তাঁর বক্তৃতা রেকর্ড করে ফেলে কেউ। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়–সোশ্যাল মিডিয়ায়, সংবাদপত্রে, নিউজপোর্টালে। সম্মেলনের পর কয়েকজন কর্পোরেট সংস্থার প্রতিনিধি তানিমের কাছে আসে। একজন বলে,

–'তোমার জন্য ঢাকায় একটা সামাজিক প্রকল্পে ৫০ হাজার টাকার চাকরি আছে। থাকাও নিশ্চিত, শুধু তোমার মতই দরকার।' আরেকজন প্রস্তাব দেয় একটি উন্নয়ন সংস্থার 'গ্রামীণ নেতৃত্ব' প্রজেক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ার।

তানিম কাঁপে না, কিন্তু চুপ থাকে। এই সময় তাঁর পাশে আসে অনিরুদ্ধ, ঢাকার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে বলে,– 'তুই থাকলে হয়তো বড় কিছু করতে পারবি। কিন্তু বড় মানেই কি দূরে যাওয়া?' তানিম জিজ্ঞেস করে,

–"তুই কী করিস?"

–"আমি লিখি। কিন্তু লিখি শহরের ভেতর গ্রাম খুঁজে পেয়ে।"

–"তুই ফিরবি কোনোদিন?"

–"না, আমি ফিরিনি কখনো। এই ব্যর্থতা বয়ে বেড়াচ্ছি।"

অনিরুদ্ধের কথায় কিছু যেন তানিমের ভেতর আলোড়ন তোলে।

এক সন্ধ্যায় হোস্টেলে বসে তানিম চিঠি খোলে। নুপুরের লেখা নতুন চিঠি–কিন্তু এবার সে লিখে,

–"তোর কাজ এখন গ্ল্যামারের আলোয় ঢেকে যাচ্ছে। কিন্তু জানিস, আমাদের ক্লাবের পেছনের টিনশেড ঘরটা ঝড়ে উড়ে গেছে।

ইমন বলেছে, আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করব না। আমি বলেছি, অপেক্ষা করাটাও একরকম সাহস।

যদি তুই না ফিরিস, তবে আমি একাই মশাল ধরব।' তানিম চুপচাপ। অনেকক্ষণ পরে তাঁর চোখে জল আসে না, আসে বুকে ঝড়। পরদিন ভোরে তানিম অনিরুদ্ধকে বলে,– 'তুই কখনও ফিরিসনি, আমি ফিরব। তুই শব্দ দিয়ে লড়িস, আমি হাত দিয়ে গড়ব। আমার আলো, শহরের আলো নয়– আমার গাঁয়ের আলো।'

তানিম ট্রেনে ওঠে। জলপাই গাছের নিচে ফিরবে বলে।

৫.

গ্রামে ফিরেই তানিম বুঝতে পারে, সময় থেমে থাকেনি। ঝড় এসে শুধু টিনশেড ছিঁড়ে দেয়নি–ভেঙেছে কিছু স্বপ্ন, কিছু সম্পর্ক। তবে মাটির নিচে বীজগুলো বেঁচে আছে। শুধু দরকার একটু জল, একটু আলো। আলোকপাঠের পুরনো ঘরে ঢুকে তানিম দেখে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বইয়ের পাতা, ছেঁড়া পোস্টার। দেয়ালে লেখা: 'এই ঘরটা ভেঙেছে ঝড়, কিন্তু আমাদের সাহস এখনও দাঁড়িয়ে আছে।' এই লেখাটা নুপুরের হাতে লেখা। সে এসে পাশে দাঁড়ায়, বলে– 'তুই এলি, তাইতো আমরা আবার শুরু করতে পারি।' কিন্তু সবার মনে এক প্রশ্ন– তানিম চলে গেল, এখন সে ফিরেও এলে বিশ্বাস করবে কে? ইমন মুখোমুখি হয়– 'তুই যখন শহরের গরম চা খাচ্ছিলি, তখন আমরা এখানে বই বাঁচানোর জন্য ছেঁড়া পর্দা দিয়ে ছাউনি দিছি।

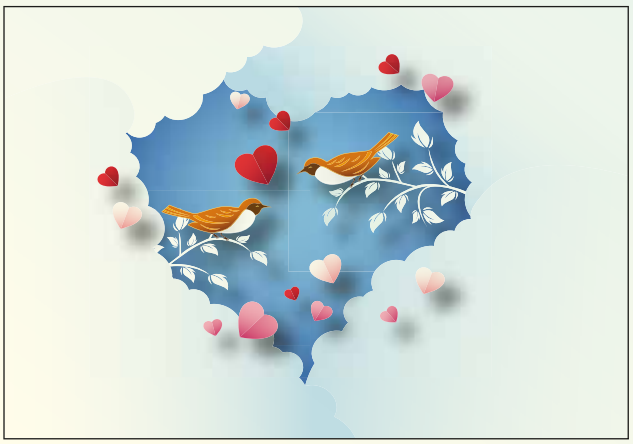

–'তুই এখন আবার নেতা হবি? আমরা না হয় শুধু সৈনিক?' তানিম জবাব দেয় না। সে পরদিন নিজেই কোদাল নিয়ে ক্লাবঘরের ভাঙা অংশ পরিষ্কার করতে শুরু করে। নুপুরও, অন্যরাও আসে। তিনদিন পর ইমনও আসে হাতে হাতুড়ি নিয়ে। –'তুই নেতা হ, ভাই। কিন্তু আমি তোর পাশে থাকি। কারণ তোর ফেরা প্রমাণ করে–তুই পালিয়ে যাস না।'

গ্রামের মানুষ এবার পাশে দাঁড়ায়। একদিন খোদ কাদির মিয়া এসে বলে– 'তুই আমার ভুলটা ধরায়া দিছস। এই ক্লাব যদি স্কুলের পাশে হয়, আমি জমি দিমু।' শুরু হয় নতুন ঘরের কাজ। তানিম পরিকল্পনা করে "আলোযাত্রা"–গ্রামে প্রথমবারের মতো একদিনব্যাপী উৎসব। এর অংশ: গ্রন্থমেলা, আলোকযোদ্ধা সম্মাননা; ছাত্র-অভিভাবক সংলাপ; সন্ধ্যায় নাটক: "আঁধার ভাঙা

গান" নাটকে নুপুর অভিনয় করে। সেই রাতে হাজার মানুষের সামনে নুপুর বলে–

'আমরা শুধু স্বপ্ন দেখি না, আমরা জেগে থেকে তা বানাই।' এক রাতে তানিম ও নুপুর জলপাই গাছের নিচে বসে।

তানিম বলে– 'তুই জানিস, আমার ফিরে আসা হয়তো সাহসের কাজ ছিল। কিন্তু তুই না থাকলে সাহসটা টিকত না।'

নুপুর বলে– 'আমরা কেউ কাউকে বাঁধিনি। আমরা একসাথে হাঁটছি, একে অপরকে ঠেলে দিচ্ছি সামনে।'

তারা দু'জন জানে–তাদের সম্পর্ক প্রেম না হলে কী আসে যায়?

তা বিশ্বাসের, সংগ্রামের, আলোয় ফেরার গল্প।

৬.

"তরুণ কল্যাণ সংঘ" এখন আর শুধু এক গ্রামের উদ্যোগ নয়। চারপাশের ৬টি গ্রামের তরুণরা এতে যুক্ত হয়েছে।

তানিম বলেছে– 'আমরা কোনো কেন্দ্র না, আমরা সংযোগ। আমাদের কাজ হলো একে অপরের হাত ধরা, আলো নেওয়া আর ফেরানো।' নুপুর এখন পুরো প্রকল্পের শিক্ষা শাখা চালায়। ইমন যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলছে। একদিন জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা আসে– "মাটির তারা সম্মাননা" তাঁদের সমাজ বদলের স্বীকৃতি। সেই মঞ্চে তানিম বলে– 'আমি তারকা না, আমরা সবাই মাটির তারা। আমরা আলো দিই, তবে মাটিতে দাঁড়িয়ে। আকাশে উড়তে চাই না, চাই শুধু মাটির গন্ধে থাকি।' সেই বক্তব্য ভাইরাল হয়। কিন্তু আলোর সঙ্গে ছায়া আসে। সংগঠনের ভেতরে নতুন একজন সদস্য রুবেল, যাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ভিন্ন। সে চায় এই সংগঠনকে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম বানাতে। একদিন রুবেল চুপিচুপি এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে– সংগঠনকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। তানিম জানতে পেরে মিটিং ডাকে। নুপুর বলে–

'আমরা কোনো পতাকার নিচে থাকব না, আমাদের পতাকা আমাদের কাজ।' তানিম রুবেলকে বহিষ্কার করে, কিন্তু ব্যথা পায়। সেই বছরেই সংগঠন আয়োজন করে তাদের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান:

"আলোক-পাঠ উৎসব" ১০ গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে ৩ দিনের অনুষ্ঠান: *বিতর্ক প্রতিযোগিতা *সমাজ উদ্যোগ প্রদর্শনী *সন্ধ্যায় নাটক: "আলোর জন্ম: শেষ রাতে, সব আলোর মাঝে তানিম, নুপুর, ইমন দাঁড়িয়ে। তানিম বলে–

-'আমরা শুরু করেছিলাম ছেঁড়া বই দিয়ে, আজ আমাদের আছে ৩৫০ জন পাঠক, ১৮ জন শিক্ষক, ৬টি পাঠাগার।

আমাদের কাছে এই সংখ্যাগুলো বড় না, বড় হলো এই বিশ্বাস– 'যদি তুমি আলো হও, তবে অন্য কেউ অন্ধকারে থাকবে না।' অনুষ্ঠান শেষে জলপাই গাছের নিচে তানিম ও নুপুর আবার দেখা করে। তানিম চুপ করে বলে–

-'তুই পাশে না থাকলে এতদূর আসতে পারতাম না।' নুপুর হেসে বলে– 'তুই না এলে আমি দাঁড়াতাম না। আমরা কেউ কাউকে ছায়া দিইনি, আমরা একে অপরের আলো ছিলাম।'

তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সম্পর্ক কোনো নাম চায় না, কারণ এ সম্পর্ক গড়া ছিল সমাজ বদলের শপথ দিয়ে– Not just by love, but by purpose love. জলপাই গাছের ছায়া এখন আর শুধুই এক ছায়া নয়, তা এক ইতিহাস,

যেখানে কয়েকজন তরুণ বিশ্বাস করেছিল; অন্ধকার ভাঙে ধ্বংস দিয়ে নয়, আলো দিয়ে এবং তাঁরা আলো হয়ে উঠেছিল, মাটির তারার মতো।

লেখক পরিচিতি: মো: নাফিউল ইসলাম, শ্রেণীঃ স্নাতক ২য় বর্ষ, রোলঃ ৬০২
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

ছোটগল্প

এক বিকেলের বনোফুলেরা

মোছা: রিমিয়া খাতুন

আকাশটা আজ অদ্ভুত রকম শান্ত। কুয়াশা নয়, অথচ একটা হালকা ধোঁয়াসম ছায়া যেন চারপাশে। জানালার কাঁচ ছুঁয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়ছে ঘরের কোণে, ঠিক সেই জায়গায় যেখানে ফ্লোপসি গুটিশুটি মেরে বসে থাকে তার প্রিয় বেতের চেয়ারে। আমি তাকে দেখি। আর ঠিক সেই সময়টাতেই, গোটা বিকেল আমার হাতছাড়া হয়ে যায়।

ঘাসফড়িং এসে বসে আমার পায়ের কাছে। সেও যেন শোনে আমাদের কথা। কিংবা হয়তো খবর আনতে এসেছে বাগানের কোনো ফুল ফুটেছে আজ, কোনটা শুকিয়ে গেছে নিঃশব্দে, কোন ফুল কবে অস্ত যাবে, কোনটা প্রেমিকের হাতে সযত্নে ছিঁড়ে নেওয়া হবে। কাঠগোলাপের সুবাস ছড়াতে শুরু করেছে, কদমের হলুদ রং আস্তে আস্তে সাদায় বদলে যাচ্ছে, বাগানের কত রঙের কত গল্পের ছাপ!!.... ঘাসফড়িংয়ের চোখে আজ যেন অন্যরকম কিছু। আমি তা বুঝে উঠতে পারি না। এই নিরবতা কি সময়ের ক্লান্তি , নাকি কোনো না বলা অভিমান?

ফ্লোপসিও আজ কেমন চুপচাপ, হটাৎ আমার গাঁ ঘেঁষে ডেকে উঠে, "মেও.... সেও বোধহয় ঘাসফড়িংয়ের অভিমানী চোখ পড়ে ফেলেছে! আমরা কথা বলি, ছেঁড়া ছেঁড়া গল্পে মিশে যায় জীবনের অনেক অনুচ্চারিত অধ্যায়। বলি, কে কেমন করে এসে থেমেছিল জীবনে, কে বা নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। কে রয়ে গেছে ভুলে যাওয়ার বাইরে, কে আমার ঘৃর্ণাতেও নাই , কে জুড়ে আছে সমস্ততা জুড়ে !!!

ঠিক এমন সময়, আমার চোখ পড়ে জানালার বাইরে বাগানের এক কোণে-বনোফুলেরা দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। তারা চায় না নজর, চায় না প্রশংসা। তবু মনে হয় তাদের চোখে কথা আছে। কেমন নিঃশব্দে বিমর্ষ হয়ে ফুটে আছে তারা। যেন দীর্ঘদিনের জমানো অভিমান আমায় শোনাতে চাই। যেন বলছে, আমাদেরও একটা গল্প আছে, যদি কেউ একটুখানি শোনে !

এই ফুলেরা জন্মায় রাস্তার ধারে, দেয়ালের ফাঁকে, পুরোনো বাড়ির ছাদে, বাসার আনাচে-কানাচে। কেউ তাদের পানি দেয় না, যত্ন নেয় না। তবুও তারা জন্মায়, বাঁচে, সৌন্দর্য্য ছড়ায় নিঃশব্দে। পরিচিত নাম নেই, দামি পাত্রে রাখা হয় না, ফুলদানিতে শোভা পায় না। তাদের ঘীরে নেই কোনো আয়োজন, নেই কোনো মুগ্ধ চোখ। অথচ কত সহজে তারা একাকিত্ব ভরে থাকা একটা বিকেলকে পূর্ণ করে তোলে।

আমি ভাবি, মানুষ কথা বলার সঙ্গী খোঁজে। খুঁজে ফেরে কারো মনোযোগ। অথচ সে ভুলে যায়, কেউ কারো কথা জমা রাখে না। মানুষ যে ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হারিয়ে যায়। অথচ জীবনের সবচেয়ে মরমি মুহূর্তগুলো আসলে নির্জনতায়ই জন্ম নেয়। যেমন এই বিকেল, ছোট্ট বিড়াল ছানা, ঘাসফড়িং আর বুনোফুলেরা। গোটা একটা বিকেল চাইলেই কাটিয়ে দেওয়া যায়, এদের সাথে করে ফেলা যায় বোকাশোকা কিছু গল্প। বানিয়ে ফেলা যায় এক অন্য রকম জগৎ। ফ্লোপসি তখন ঘাস ছিঁড়ে খেলছে। ঘাসফড়িংয়ের চোখে যেন কিছুটা জল, আবার হয়তো আলো পড়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি না। শুধু বসে থাকি পাশে, এক বিকেল জুড়ে। আমাদের মাঝে কোনো শব্দ নেই, তবুও মনে অজস্র কথার ভীড়।....

আসলে মানুষ যত প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকায়, তত নিজের কাছেই ফিরে আসে। যে সম্পর্ক যত কম চাওয়া রাখে, সে তত বেশি নিখাঁদ। তাই বনোফুলেরা আমাদের শিখিয়ে যায়– যত্ন ছাড়াও প্রেম হতে পারে, নিঃশব্দেও গল্প বলা যায়, বেঁচে থাকাটাই সুন্দর।

সন্ধ্যার আলো নেমে এলে, ফ্লোপসি উঠে এসে আমার কোলে লাফ দেয়। তার বাদামী পশমে একগুচ্ছ বনোফুল গুঁজে দিয়ে বলি, "তুমি জানো তো! ওরা খুব সুন্দর" সে উত্তর দেয় না, দেয় এক নিঃশ্বাস গড়িয়ে আসা নির্ভরতাভরা স্পর্শ। ঘাসফড়িং চলে যাওয়ার আগে হেসে বলে, "সুন্দর" জিনিস চেনার "চোখ লাগে, মনোযোগী চোখ! সবসময় থাকে না।"

আমি জানি আজকের বিকেলটা আর ফেরে না। কিন্তু এই বনোফুলেরা থেকে যাবে আমার গল্পে, আমার নিঃশব্দের কোনো এক বিকেলে !!

লেখক পরিচিতি: মোছা: রিমিয়া খাতুন, অনার্স ২য় বর্ষ
রোল নং: ১৩৫৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মেহেরেপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

ছোটগল্প

ধোঁয়ার ভেতরে কে ছিল?

ফারদিন এহসান রিফাত

ঘটনাটি বেশ ক'য়েক বছর আগের। তখন রিফাত, আশিক ও মুস্তাক একই গ্রামের খুব ভালো বন্ধু ছিল। তাঁরা পরবর্তীতে তাঁদের গ্রাম আলীনগর থেকে বেশ অনেকটি দূরের জেলার চরকালিকাপুরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হয়। সেই সময় মুসলমান পিতা-মাতার ইচ্ছা ছিল ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এমনকি তাঁদের আরেকটি ধারনা ছিল যে মাদরাসায় থেকে পড়াশুনা না করলে শিক্ষা পূর্ণতা পায় না এবং ভবিষ্যতে তা ভালো ফল দেবে না। যেমন কথা তেমন কাজ তাদের পিতা-মাতা তাঁদের মাদারাসার হোস্টেলে ভর্তি করিয়ে দেয়। দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছিল রিফাত, আশিক ও মুস্তাকের। এরই মাঝে তাঁদের মাদরাসায় খবর আসে তাঁদের মাদরাসার পাশের গ্রামের কিছু লোকজন মাদরাসার কিছু মেধাবী ছাত্রদের দুপুর এবং রাতের খাবারের দায়ভার আ-জীবনের জন্য বহন করতে চায়। রিফাত আশিক ও মুস্তাক বরাবরই তাদের মাদরাসার মেধাবী ছাত্র ছিল। তাই তারা তিনজনই এই সুযোগটা পেয়ে গেল। এরপর তাঁরা তিনজন প্রতিদিন পাশের গ্রামে তাঁদের দুপুর ও রাতের খাবারের জন্য যেতে লাগলো। তাঁরা খাবার মানুষের বাড়িতে না খেয়ে মাদরাসায় নিয়ে এসে তারপর খেতো। প্রায় কয়েক সপ্তাহ পর রিফাতের বাবা এটা জানতে পেরে রিফাতকে একটি সাইকেল কিনে দেন। কেননা, উক্ত গ্রামটি ছিল মাদরাসা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। ওই গ্রামে যাওয়ার জন্য মূলত দুইটি পথ ছিল। প্রথমটি ছিল কবরস্থানের সামনে দিয়ে এবং অন্যটি কবরস্থানের পিছন দিয়ে। কিন্তু কবরস্থানের সামনের রাস্তা বেশি নিরাপদ ছিল কেননা কবরস্থানের সামনের রাস্তার উপর কিছু বসতবাড়ি ছিল। কিন্তু কবরস্থানের পিছনের দিকে কোনো বাড়ি ঘর ছিল না। কোন শিক্ষকই তাদের কবরস্থানের পিছন দিক দিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেননি। ঠিক এমন করে তারা প্রতিদিন একই রকম ভাবে খাবার নিয়ে আসে এবং মাদরাসায় খাওয়া দাওয়া করে। বৃহস্পতিবার' দিনটি ছিল হাট করার দিন। এইদিনে গ্রামের সকলে বাজারের দিকে যায় হাট করার জন্য। এদিকে মাদরাসার এক শিক্ষক কোনো গাড়ি না পেয়ে রিফাতের সাইকেল নিয়ে চলে যায়। বিকেল হয়ে আসে কিন্তু স্যার আর আসে না। ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেয় পায়ে হেটেই তাঁরা খাবার আনতে যাবে। রিফাত, আশিক ও মুস্তাক খাবার নিতে গিয়ে দেখে মুস্তাকের খাবার তখনও রান্না করা হয়নি। ফলে মুস্তাক যে বাড়ি থেকে খাবার নিতো সেখান থেকে তাঁকে তালের রুটি দেওয়া হয়। এসব নিয়ে তাঁরা যতক্ষণে মাদরাসায় ফিরবে ততক্ষণে প্রায় মাগরিবের আযান দেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তখন রিফাত সিদ্ধান্ত নেয় সময় বাচানোর জন্য তাঁরা কবরস্থানের পিছন দিক দিয়ে যাবে। কেননা মাগরিবের নামাজ মাদরাসায় না পড়লে তাঁদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো। প্রথমে না হলেও পরে আশিক ও মুস্তাক রিফাতের কথা মেনে নিলো। তাঁরা কবরস্থানের পিছনের গলিতে ঢোকার সাথে সাথে তাঁদের মনে এক অন্য রকম ভয় দানা বাঁধতে লাগলো। একটি ধ্বসে পড়া কবর থেকে শিয়াল হঠাৎ বেরিয়েই দৌড় দিল। আধো আলো, আধো অন্ধকারে তাঁদের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। এরই মধ্যে আশিক ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কিছু একটা সাদা ধোঁয়া দেখে দৌড় শুরু করলো। আশিকের পিছু পিছু রিফাত ও মুস্তাকও দৌড় দিলো কিন্তু মুস্তাক পা হড়কে পড়ে গেল। আশিক ও রিফাত কবরস্থান পার হয়ে এসে দেখলো মুস্তাক তাঁদের সাথে নেই। তাই তাঁরা আবার পিছনে গিয়ে দেখলো মুস্তাক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আশিক ও রিফাত মুস্তাকের শরীরে বারবার ঝাকি দিয়ে তাঁকে উঠালো।

মুস্তাক বললো-'কেউ আমার পিঠে ধাক্কাদিয়ে আমাকে ফেলে দিয়ে ছিল। দেখতে রূপসী নারীর মতো। হয়তো জ্বিন বা পরী হবে!' তাঁরা ঠিক করে স্যারকে কিছু বলবে না। পরের দিন থেকে তিনজনেরই প্রচুর জ্বর হয় যা ছাড়ার নামও নেয় না। রিফাত ও আশিক তাদের বাবা মাকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলে। তাঁদের বাবা তাদের মসজিদের ইমামের সাথে ঝাড়ফুক করিয়ে নেয়। কিন্তু মুস্তাক এসবের কিছুই করায় না। পরেরদিন রিফাত ও আশিক মাদরাসায় ফিরে আসে। কিন্তু মুস্তাক খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনো ডাক্তার বা কবিরাজ এই জ্বরের চিকিৎসা করে সারাতে পারে না। এমন করে দিন যায় সপ্তাহ যায়। দুই মাসের মধ্যে মুস্তাক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পরে রিফাত ও আশিক মাদরাসা ত্যাগ করে। কিন্তু মুস্তাকে মা ছেলে হারানোর শোকে পাথর হয়ে যায়। মুস্তাকের বাবা আজও বলে– 'যদি মুস্তাক বেঁচে থাকতো তবে হয়ত তোমাদের মতো হতো ওর ভবিষ্যৎ।'

লেখক পরিচিতি: ফারদিন এহসান রিফাত
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

নিবন্ধ

ডি ভ্যালেরা - ডাকাত থেকে বিজ্ঞানী

মোহা: খসরু ইসলাম

উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে ফ্রান্স সরকারের বুক কাঁপানো এক ডাকাতের আবির্ভাব হয়েছিল, নাম তার- ডি ভ্যালেরা। সে ডাকাতির সময় অস্ত্রের ব্যবহারের চেয়ে মেধার ব্যবহারই বেশি করতো। সুঠাম দেহের সুদর্শন যুবক। শৈশবেই বাবা-মা-কে হারিয়ে এক নিয়ন্ত্রণহীন জীবন পেয়েছিল সে। চারিত্রিক কারণে হোক বা সঙ্গদোষেই হোক সে এক কুখ্যাত ডাকাতে পরিণত হয়েছিল। সে পর পর দু'বার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে প্রথমবার ছয় মাস এবং দ্বিতীয়বার বারো মাস জেল খেটে তৃতীয়বারের মত আবারো জেলের ঘানি টানছিল। এর আগে দু'বার সে জেল থেকে স্বাভাবিকভাবে মুক্তি পায়নি। সে একজন জেল পালানো আসামি। তাঁকে কোনোভাবেই আটকানো যায় না। প্রতিবারেই সে তাঁর মেধাকে কাজে লাগিয়ে জেল থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। তাই এবার তাঁর জেল জীবন অতিরিক্ত তদারকির মধ্যেই কাটছে।

কিন্তু মাস তিনেক পর সব নিরাপত্তাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আবারো জেল থেকে পলায়ন। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ধরার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণা করলেন। মুক্ত আলো বাতাস তাঁর কপালে বেশিদিন সইলো না। তিন মাস পূর্ণ হতে না হতেই সে আবারও চতুর্থবারের মত জেল কর্তৃপক্ষের কব্জায়। বার বার পালিয়ে যাবার প্রেক্ষাপটে জেল কর্তৃপক্ষকে এবার তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হলো। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, ডিভ্যালেরা-কে একা জেলখানা সংলগ্ন একটি বাড়িতে স্পেশাল জেলখানায় রাখবেন। তাঁদের ধারণা জেলখানার কয়েদি বা নিরাপত্তা প্রহরীদের ব্যবহার করে সে বার বার পলায়ন করে। সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ডিভ্যালেরা এবার ব্যতিক্রমী জেলখানায় থাকতে লাগলো। নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার জেল পালানোমেধা সংকীর্ণ চার দেয়ালের মধ্যে দ্যুতি ছড়াতে পারলো না বরং ক্ষয় হতে লাগলো।

অনেকদিন পর ডি ভ্যালেরা একটি পেনসিল ও একটি সাদা কাগজ পাওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষের কাছে সে আবার একই বিষয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে আদায় করতে পেরেছিল। কারণ হিসেবে দেখিয়েছিল সে একটু আধটু ছবি আঁকতে পারে, তাই সে আর্ট করতে চায়। প্রথমতঃ সে আইফেল টাওয়ারের একটি সুন্দর ছবি এঁকে জেল

সুপারকে উপহার হিসেবে পাঠালেন। উপহারটি গ্রহণ করে জেল সুপারের মন যতটুকু আনন্দিত হয়েছিল তার অনেকগুণ বেশি আন্দোলিত হয়েছিল ডি ভ্যালেরার ডাকাতিয়া মন। এভাবেই সে গাছ, পাহাড়, নদী ইত্যাদি ছবি আঁকতে লাগলো আর জেল সুপারের কাছে পাঠাতে লাগলো। এটি নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল।

২

ডি ভ্যালেরার খোঁজ নেওয়ার মতো তেমন কেউ ছিল না। একজন বাল্যবন্ধু কেবল তার খোঁজ-খবর নিতেন। বন্ধুটি একটি কারখানায় কাজ করতো। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে খাবার এনে জেল কর্তৃপক্ষকে দিতেন, কর্তৃপক্ষ খাবারের বক্সটি পরীক্ষা

করে ডি ভ্যালেরাকে দিতেন। কিন্তু বন্ধুর সাথে কখনো দেখা করতে দিতেন না। একদিন একটি কাগজে পেনসিলের আঁচড়ে সে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকলো এবং উপরে কাগজের কোণায় লিখে দিল 'জন্মদিনের উপহার'। তারপর সে জেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে বললো, "পৃথিবীতে আমার আপন বলে কেউ নাই একমাত্র বন্ধুটি ছাড়া। তাই সামনে বিশ তারিখে আমার বন্ধুর জন্মদিনে আমি এ উপহারটি পাঠাতে চায়।" ছবিটি ছিল খুব সিম্পল। দু'টি পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পানির প্রবাহ এবং দু'পাহাড়ের মধ্যে উদিত সকালের সূর্য। জেল সুপার খুব ভালোভাবে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। সন্দেহ সৃষ্টি হয় এমন কোনো কিছুই ছবিতে ছিল না। জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ছবিটি বন্ধুটির হাতে তুলে দেয়া হলো। বন্ধুটি জন্মদিনের উপহার পেয়ে আবেগে আপ্লুত হলো।

জন্মদিনের উপহার হাতে পাওয়ার কয়েকদিন পর বন্ধুটি জন্মদিনের কেক নিয়ে ডি ভ্যালেরাকে দেখতে গেল। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের জানা ছিল তাই জোরালো আপত্তি ছাড়াই ডি ভ্যালেরাকে পৌঁছে দেয়া হলো। তবে কেক দেয়ার আগে সেটি ভেঙ্গে পরীক্ষা করা হলো। এরপর বড়দিন উপলক্ষে বন্ধুটি প্রচুর খাবার দিয়ে গেল। যার মধ্যে ছিল কেক ও স্যান্ডউইচ। সেদিনও কিছু কিছু কেক এবং স্যান্ডউইচ ভেঙ্গে পরীক্ষা করে দেয়া হয়েছিল। বড়দিনের পরের দিন হঠাৎ করে দেখা গেল স্পেশাল কারাগার শূন্য। ডি ভ্যালেরা যথারীতি আবার পালিয়ে গেছে।

কিন্তু কীভাবে সম্ভব হলো? বন্ধুর কাছে পাঠানো প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতে দুই পাহাড়ের মাঝে যে সূর্যোদয়ের ছবি ছিল তার বৃত্তাকার চিত্রটি ছিল জেলখানার তালার ফাঁকের সমান। ছবিটির কোণায় লেখা ছিল জন্মদিনের উপহার। কিন্তু তখন বন্ধুর জন্মদিন ছিল না। বন্ধুর কাছে এটাই মূল রহস্য ছিল। বন্ধুটিও ডি ভ্যালেরার চেয়ে দু'কাঠি উপরে। তিনি চিন্তা করতে থাকলেন নিশ্চয় এমন কিছু রহস্য আছে এ ছবিতে। শেষে অনুমান করে সিদ্ধান্ত নিলেন সূর্যের বৃত্তাকার অংশের সমান করে একটি চাবি বানিয়ে পাঠাবেন। চাবিটা বানিয়ে পাঠানোর জন্য বন্ধুটি মাঝে মাঝে ভনিতা করে বিভিন্ন খাবার পাঠাতে লাগলেন এবং জেল কর্তৃপক্ষকে একটা অভ্যাসের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পেরেছিলেন। শেষে বড়দিনকে বেঁছে নিলেন। সেদিন খাবারের মধ্যে থেকে একটি স্যান্ডউইচের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে চাবিটি পুরে দিলেন। বন্ধুটি বড়দিন উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কিছুটা শৈথিল্যের সুযোগ আশা করেছিলেন এবং তাই-ই হয়েছিল।

পরবর্তীতে ডি ভ্যালেরাকে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে তাকে একটি বিজ্ঞান গবেষণাগারে চাকরি দেয়া হয়েছিল। ডি ভ্যালেরা হয়ে গেল ডাকাত থেকে বিজ্ঞান গবেষক।

লেখক পরিচিতি: মোহা: খসরু ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক (অবঃ), পদার্থবিজ্ঞান
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

নিবন্ধ

যুক্তিই হোক মুক্তির পথ

মোছা: আলেয়া খাতুন আলো

"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" সুতরাং, জ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নেই। ছাত্রজীবন মানেই অধ্যয়নরত জীবন, যেখানে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। আর জ্ঞানের সেই পরিধিকে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ করতে বিতর্ক অনুশীলন এক অনন্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। বিতর্ক শব্দটি শুনে আপনারা আবার ভাববেন না যে, এখানে শুধু তর্ক আর দ্বন্দ্ব চলে। এখানে থাকে যুক্তির দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্বটা বৈরী নয়, অবৈরী। বিতর্কে থাকে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসম্মত দক্ষ উপস্থাপনা। ছাত্রজীবনে জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ হিসেবে বিতর্ক চর্চাকে আমি সহায়ক বলে মনে করি।

কেননা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব বিকাশে সাহায্য করে। আমরা সবাই বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। এই বাংলা ভাষাতেই খুব সাধারণ একটি বিষয় নিয়ে পাবলিক স্পিকিং করতে বললে, আমরা অনেকেই রাজি হবো না। আবার, অনেকেই হয়তো বলতে পারবো, কিন্তু জড়তার কারণে সাহস জুগিয়ে উঠতে পারবো না। আবার, এসব কাটিয়ে বলতে গিয়ে গুছিয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারি না। অথচ এই ভাষাতেই ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কথা বলে চলেছি।

সুতরাং, কোনো ভাষার ক্ষেত্রে বিষয়টি হচ্ছে এমন-এর দক্ষতা অর্জনে অনুশীলনের প্রয়োজন। বিতর্ক চর্চা আপনার বাক্‌জড়তা দূর করতে সাহায্য করবে। এটির অনুশীলনের প্রস্তুতি আপনাকে আরও জ্ঞানী করে তুলবে। কেননা, বিতর্কে থাকে ভাষার ব্যবহার, উদ্ভাবনার শক্তি ও উপস্থাপনার দক্ষতা। বিতর্ক বিদ্যাকে জ্ঞানের এবং জ্ঞানকে প্রজ্ঞার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এটি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চারই অংশ। এটি যেমন আপনাকে মনের অনুভূতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে সাহায্য করবে, তেমনি ব্যক্তি জীবনেও গড়ে তুলবে আত্মবিশ্বাসী এবং সৃজনশীল মানুষ হিসেবে। ছাত্রজীবনে বিতর্কের গুরুত্ব বলতে গেলে হয়তো খুব কম করেই বলা হবে আমার। বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলন ঘটে বিতর্কে। বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির অনুশীলন, যা আপনার পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি আপনাকে আরও জানতে সাহায্য করবে, স্বল্প সময়ে যুক্তিসম্মত বক্তব্য উপস্থাপন এবং উপস্থিত বুদ্ধির ব্যবহার আপনার জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে। সেই সঙ্গে জ্ঞানের আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে।

বিতর্ক হলো এমন একটি চর্চাকেন্দ্র, যেখানে জ্ঞানের শক্তি সঞ্চয়ের কাজে সহায়ক হয়।

বিতর্কে আপনাকে প্রতিপক্ষের মতামত শোনাবে, আপনি সেই মতামত অস্বীকার করবেন না; বরং প্রতিপক্ষের মতামতের গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আপনাকে সহনশীল আচরণ করতে শেখাবে।

বিতর্কে থাকে প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত বক্তব্য। জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ থাকে বিতর্কে। তাই বিতর্ক হচ্ছে জ্ঞানের সহযোগী। অনেকে হয়তো মনে করে, বিতর্ক অনুশীলনে

সময়ের অপচয় হয়, অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে। এগুলো সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটি সময়ের অপচয় নয়, এটি আপনাকে শিক্ষাগতভাবে দক্ষ করবে। যার প্রভাব ও উপকারিতা আপনার ছাত্র ও ব্যক্তি জীবনে পড়বে। আপনার অ্যাকাডেমিক পড়াশোনাকে আরও বেগবান করে তুলবে।

আমি একজন বিতর্ক-অনুরাগী ব্যক্তি হিসেবে স্বপ্ন দেখি মেহেরপুর ডিবেটিং সোসাইটি ক্লাব বিতার্কিকদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। মেহেরপুর সরকারি কলেজ হবে বিতর্কের প্রাণকেন্দ্র এবং মানবিক চেতনার অগ্রসূত্র। তারই ধারাবাহিকতায় আপনাদের বির্তকপ্রেমী হওয়ার আহ্বানে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস ব্যক্ত করলাম।

লেখক পরিচিতি: মোছা: আলেয়া খাতুন আলো, অর্থনীতি বিভাগ (মাস্টার্স) ও প্রাক্তন সভাপতি, ডিবেটিং সোসাইটি, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

নিবন্ধ

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল : সংঘাতের ইতিহাস

ইসতিয়াক আহমেদ খাঁন

ইহুদিরা মূলত পবিত্র তাওরাত অনুসারে, ইসরায়েলি জাতির সন্তান। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ইহুদিরা হলো হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধর, যিনি ইহুদিদের প্রাচীনতম পুরোধা। ইহুদিরা নিজেদেরকে 'বনী ইসরাইল' (ইসরায়েলের পুত্র) হিসেবে পরিচিত করে। এদের ধর্মীয় ইতিহাস তাওরাত বা বাইবেলের পুরাতন বিভাগে বর্ণিত। প্রাচীনকালে, বিশেষত খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে, ইহুদিরা এই অঞ্চলেই বসবাস করত। প্রথমে তারা ছোট ছোট জনপদে বসবাস করত, পরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের সবচেয়ে পরিচিত রাজ্য ছিল 'ইসরায়েল রাজ্য' এবং 'ইহুদা রাজ্য', যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন সময়েই। বায়তুল মাকদিস (পূর্ববর্তী উপাসনালয়) তাদের অন্যতম পবিত্র স্থান ছিল।

ফিলিস্তিন অঞ্চলটির গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল এখানকার উপাসনালয়, বিশেষত প্রথম এবং দ্বিতীয় উপাসনালয়। প্রথম উপাসনালয় ছিল কিং সোলায়মানের (হযরত দাউদ আ.-এর ছেলে) সময়, যা খ্রিষ্টপূর্ব ১০ম শতকে নির্মিত হয়েছিল। পরে, খ্রিষ্টপূর্ব ৬শ শতকে এই উপাসনালয় ধ্বংস হয়, এবং পুনরায় দ্বিতীয় উপাসনালয় নির্মিত হয়। ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বাস করে যে, তাঁরা হলো আল্লাহর (ইহুদিদের মতে 'যিহোভা') নির্বাচিত জাতি। আল্লাহ তাদেরকে এই অঞ্চলের অধিকারী করে পাঠিয়েছেন এবং এই ভূমিতে তাদেরই অধিকার থাকবে তাওরাত (ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ) এই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। তাওরাতের মধ্যে ইহুদিদের এই ভূমি দখল ও তাদের উপর সৃষ্টির লক্ষ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাতের সিংহভাগ অংশে ঈশ্বরের নির্দেশে 'বনী ইসরাইল'কে বিশেষ ভূমি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'এটি তোমাদের জন্য ভূমি যা আমি তোমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের বংশধরদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম' (আত-তাওরাত, যিহোশুয়া ১:৩) ইহুদিরা তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এই ভূমি অধিকারী হতে দাবি করে, কারণ তাওরাত অনুযায়ী, আল্লাহ তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধরদের জন্য এই ভূমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাদের এই ভূমিতে বসবাসের অধিকার দিয়েছেন এবং তারা এখানে দীর্ঘকাল ধরে বাস করেছিল। প্রাচীন কালের ইহুদি রাজ্য ইসরায়েল এই ভূমিতে গড়ে উঠেছিল, তবে তারা বিভিন্ন সময় নিজেদের ধর্মীয় বিচ্যুতি, নবী হত্যা, এবং অন্যায়ের কারণে আল্লাহর গজবে পতিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ৭০ খ্রিষ্টাব্দে, যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বাহিনী জেরুজালেমে হামলা চালিয়ে দ্বিতীয় বায়তুল মাকদিস (ইহুদিদের উপাসনালয়) ধ্বংস করে দেয়। এরপর ইহুদিদের একটি বিরাট অংশ এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়।

এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ান যখন ইহুদিদের বিদ্রোহ দমন করে এই অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন Palaestina বা "প্যালেস্টাইন"। এটি ছিল রোমানদের পক্ষ থেকে ইহুদিদের প্রতি এক অপমানসূচক আঘাত, কারণ তারা নামটি দিয়েছে ইহুদিদের চিরশত্রু ফিলিস্তি জাতি (Philistines)-এর নাম অনুসারে। এই সময় থেকে ইহুদিরা চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এই ঘটনাকে বলা হয় "Diaspora" (বিচ্ছিন্নতা)। আবার যখন মুসলমানদের নবীন খেলাফত গড়ে ওঠে বিশেষ করে হযরত আবু বকর (র.)-এর সময় থেকে শুরু করে হযরত উমর (র.)-এর শাসনকালে বাইজেন্টাইন খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের দখলে থাকা ফিলিস্তিন মুসলমানদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খেলাফতের সময়ে, মুসলিম বাহিনী বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক যুদ্ধ করে জেরুজালেমসহ পুরো ফিলিস্তিন জয় করে নেয়। এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (র.), হযরত আমর ইবনে আস (র.) এবং হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (র.)। জয়ের পরে, খ্রিষ্টানরা চেয়েছিল, খলিফা উমর (র.) নিজ হাতে জেরুজালেমের চাবি গ্রহণ করুন। তখন তিনি স্বয়ং জেরুজালেমে প্রবেশ করেন, এবং অত্যন্ত বিনয় ও শান্তিপূর্ণ আচরণে ফিলিস্তিনের শাসন গ্রহণ করেন। তিনি খ্রিষ্টানদের গির্জা রক্ষা করেন, কাউকে তাদের উপাসনালয় ধ্বংস করতে দেননি। তার এই চুক্তি ইতিহাসে 'উমরী চুক্তি' নামে খ্যাত। এরপর তিনি আল-আকসা মসজিদের স্থান চিহ্নিত করে মুসলিম উম্মাহর তৃতীয় পবিত্র মসজিদে প্রথমবারের মতো সালাত আদায় করেন। এখানে তিনি নিজ হাতে ময়লা পরিষ্কার করে নামাজের জায়গা প্রস্তুত করেন। এটি ছিল মুসলমানদের এক মহান আত্মত্যাগ ও ফজিলতের বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিটলার এবং তার নাজি শাসনব্যবস্থা যে ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছিল, তা ইতিহাসের একটি অন্যতম কালিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'হোলোকাস্ট' নামে পরিচিত এই গণহত্যায় প্রায় ৬ মিলিয়ন ইহুদি প্রাণ হারায়। ইহুদিদের ওপর এই নির্যাতন মূলত হিটলারের জাতিগত ঘৃণার কারণে হয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল যে, ইহুদিরা মানব জাতির শত্রু এবং পৃথিবী থেকে তাদের মুছে ফেলাই একমাত্র সমাধান। এছাড়া, হিটলার তার বিখ্যাত উক্তিতে বলেন, 'আমি কিছু ইহুদি রেখে যাচ্ছি যাতে পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারে কেন আমি ইহুদি হত্যায় মেতে উঠেছিলাম এবং তারা যেন আমাকে ভুল না বোঝে।' এই উক্তির মাধ্যমে হিটলার নিজের ঘৃণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছিলেন, যা একদিকে তার ইহুদিবিরোধী মনোভাবকে চূড়ান্তভাবে প্রতিফলিত করে এবং অন্যদিকে, তার শাসনের শিকার হওয়া লাখ লাখ ইহুদির দুর্দশার অল্প কিছু বিবরণ দেয়। তবে, এসব হত্যাযজ্ঞের পর পৃথিবীজুড়ে ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি বাড়ে এবং তাদের জন্য একটি 'আশ্রয়স্থল' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই সময় ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনকে তাদের ম্যান্ডেটের আওতায় নিয়েছিল। ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় ঘর প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশরা 'ব্যালফোর ডিক্লেয়ারেশন' দেয়। এই ঘোষণা, যার ফলে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়, মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক বিরোধ সৃষ্টি করে। ফিলিস্তিন ছিল মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী ভূমি, যেখানে ইসলামিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় স্থানগুলো অবস্থিত, যেমন আল-আকসা মসজিদ, যা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র।

এবং পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের জন্য

যে 'দুটি রাষ্ট্র' পরিকল্পনা দেয়, তাতে ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যা ছিল ইসরায়েল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। তবে, এই পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনের মুসলিম জনগণের অধিকার এবং ভূমির প্রতি কোনো মনোযোগ না দেওয়ার কারণে তারা এই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে, মুসলিমদের জন্য যে ভূমির অধিকার ছিল, সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলিমরা নিজেদের ভূমি হারিয়ে ফেলেন এবং শরণার্থী হয়ে পড়েন। এটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি বড় আঘাত, কারণ তাদের ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক ভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা মুসলিমদের দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল একটি অবিচার, যা আজ পর্যন্ত চলমান ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষের মূল কারণ। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, এই ভূমি তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক বরাদ্দ, এবং তা কোনো একক জাতির নয়, বরং মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী ভূমি হিসেবে তাদের কাছে পবিত্র। ১৮৯৭ সালে 'জায়নিস্ট কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডের বাসেলে, যেখানে বিশ্ব ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। তারা প্যালেস্টাইনকেই তাদের 'ঐতিহাসিক মাতৃভূমি' দাবি করে। অথচ সে সময় প্যালেস্টাইন ছিল ওসমানীয় খিলাফতের অধীনে, যেখানে মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা মিলেমিশে শত শত বছর ধরে বসবাস করছিল। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার ব্যালফোর 'ব্যালফোর ডিক্লেয়ারেশন'-এ ঘোষণা দেন, প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনগণের জন্য একটি "জাতীয় ঘর" প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে ব্রিটেন। এই প্রতিশ্রুতি ছিল মুসলমানদের পিঠে ছুরি চালানোর মতোই। কারণ, সে সময় প্যালেস্টাইনে ৯০% জনসংখ্যাই ছিল মুসলমান ও খ্রিষ্টান-ইহুদি ছিল মাত্র ১০%। এরপর, ব্রিটিশরা ১৯২০ সাল থেকে প্যালেস্টাইনকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, এবং বড়ো করে ইহুদিদের অভিবাসন শুরু হয় ইউরোপ থেকে। মুসলমানরা তখন থেকেই প্রতিরোধ শুরু করে, কারণ তারা বুঝে গিয়েছিল, তাদের ভূমি হাতছাড়া হচ্ছে ধীরে ধীরে। এর পর শুরু হতে থাকে দখল দারিত্বের সংগ্রাম, প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ (১৯৪৮) 'আল-নাকবা'। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, ইহুদিরা একতরফাভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়, যা সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে। পরদিন, মিসর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন ও ইরাক মিলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে ইহুদিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্সের সহযোগিতায় সামরিকভাবে শক্তিশালী হয়।

ফলাফল: প্রায় ৮ লক্ষ মুসলমানকে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করা হয়। বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, পরিবার ধ্বংস হয়, গণহত্যা চলে এ সময়কে ফিলিস্তিনিরা বলেন 'আল-নাকবা'। ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেল, মুসলমানরা পেল শরণার্থী জীবন। অতঃপর ১৯৫৬ সালে ইজিপ্টের গামাল আবদেল নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসরায়েল, ব্রিটেন, ফ্রান্স মিলে হামলা চালায় মিসরের ওপর। যদিও সামরিকভাবে ইসরায়েল লাভবান হয়, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তারা আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়ে এবং বাধ্য হয় পিছু হটতে। আবার ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল মাত্র ছয় দিনে মিসর, জর্ডান ও সিরিয়ার বিশাল এলাকা দখল করে নেয় যেমন গাজা ও সিনাই উপদ্বীপ (মিসর

থেকে), পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীর (জর্ডান থেকে) ও গোলান হাইটস (সিরিয়া থেকে) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আল-আকসা মসজিদসহ পূর্ব জেরুজালেমের দখল, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য হৃদয়বিদারক ঘটনা। এরপর থেকেই মুসলমানদের অন্যতম পবিত্র স্থান ইহুদিদের দখলে চলে যায়। এখানেই শেষ না, ১৯৭৩ সালে মুসলিম দেশ মিসর ও সিরিয়া যৌথভাবে ইসরায়েলের ওপর আকস্মিক হামলা চালায়। তারা কিছুটা সফল হলেও শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইসরায়েল পাল্টা প্রতিরোধ করে এবং যুদ্ধ স্থগিত হয়। ১৯৬৪ সালে ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO) গঠিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াসির আরাফাত। তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে থাকে। তবে ১৯৮৭ সালে ফিলিস্তিনিদের ভিতর থেকে সাধারণ মানুষ, কিশোর- কিশোরী, মা-বোনেরা ইন্তিফাদা নামক এক গণপ্রতিরোধ শুরু করে পাথর দিয়ে সশস্ত্র সেনাদের প্রতিরোধ। ১৯৮৭-১৯৯৩ সালের প্রথম ইনতিফাদা ফিলিস্তিনিদের ঐক্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ইনতিফাদা ২০০০ খ্রি. ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারন আল-আকসা মসজিদ চত্বরে ঢুকে মুসলমানদের উস্কে দেন। এই অবমাননার জবাবে আবারও ফিলিস্তিন জ্বলে ওঠে। রাস্তায়, মসজিদে, ঘরে ঘরে প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ে। ইসরায়েল আরও কঠোর হয়ে ওঠে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। ২০০৬ সালে গাজার নির্বাচনে হামাস জয়ী হলে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের সরকারকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে। এরপর ইসরায়েল গাজা উপত্যকাকে চারদিক থেকে অবরোধ করে দেয় খাবার, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, পানি সব কিছুর সরবরাহ রোধ করে। মাঝে মাঝেই 'রকেট হামলার' অজুহাতে গাজার নিরীহ শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের ওপর ভয়াবহ বোমা হামলা চালায় ইসরায়েল। ২০২১ সালের আল-আকসা আগ্রাসনের প্রতিবাদে হামাস রকেট ছোড়ে, যার জবাবে ইসরায়েল গাজা ধ্বংস করে। ২০২৩ সালেও একইরকম পরিস্থিতি। ইসরায়েল বারবার আল-আকসা মসজিদে ঢুকে মুসলমানদের ওপর হামলা করে। ২০২৪-২৫ পর্যন্ত চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে হাজার হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি শহিদ হয়েছেন ও হচ্ছেন। ইহুদিরা আসলে কী চায়, আর কেনই বা আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ভূমিকে ঘিরে এত রক্তপাত? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে হাজার বছর পেছনে ধর্ম, ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিশ্রুতি আর ষড়যন্ত্রের এক গাঢ় জালে। তাদের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে একটি 'ঈশ্বরীয় দাবি' তারা বলে, এই ভূমি, অর্থাৎ ফিলিস্তিন ও আশেপাশের বিশাল অঞ্চল, তাদের ঈশ্বর যিহোভা ইব্রাহিম (আ.) এর মাধ্যমে তাদের বংশধরদের দিয়েছেন। তারা সেই ভূমিকে বলে 'এরেটজ ইসরায়েল' ইসরায়েলের ভূমি। এ দাবি শুধুই ধর্মীয় নয়, বরং একটি জাতীয়তাবাদী ও সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একত্রে গাঁথা, যা পরিণত হয়েছে এক ধ্বংসাত্মক আদর্শে। তারা মনে করে, যত কিছুই ঘটুক না কেন, এই ভূমিকে পূর্ণভাবে দখল করে তাতে কেবল ইহুদিদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই ভূমির কেন্দ্রেই রয়েছে আল-আকসা মসজিদ, যা মুসলমানদের প্রথম কিবলা, দ্বিতীয় পবিত্র স্থান। এটি ধ্বংস করে ইহুদিদের চরমপন্থীরা সেখানে গড়ে তুলতে চায় 'তৃতীয় উপাসনালয়' বা 'Third Temple' যা তাঁদের মতে মসীহ (Messiah) বা তাদের 'মুক্তিদাতা'র আগমণের পূর্বশর্ত। তারা বিশ্বাস করে, এই মন্দির নির্মিত হলে তাদের চূড়ান্ত মুক্তি আসবে, রাজত্ব শুরু হবে পৃথিবীর ওপর। আর সেই "মুক্তিদাতা" ইসলামের ভাষায় দাজ্জাল। এই পরিকল্পনা মোটেও কল্পনা নয়। ইসরায়েলের পার্লামেন্টের ভেতরে, মন্ত্রিসভার সদস্যদের মাঝেই আছে এমন দল যারা প্রকাশ্যে বলে, 'আল-আকসাকে সরিয়ে সেখানে আমাদের উপাসনালয় গড়তে হবে।' প্রতিদিন তারা এই মসজিদের চারপাশে তাণ্ডব চালায়, ভেতরে প্রবেশ করে প্রার্থনা করে, যা ইসলামি দৃষ্টিতে ভয়াবহ অবমাননা। কিন্তু শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিই না, এই যুদ্ধের পেছনে রয়েছে ভয়ংকর ভূ-রাজনৈতিক হিসাব। ফিলিস্তিন তিনটি মহাদেশ এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। তেল, গ্যাস, বন্দর, সামুদ্রিক নিয়ন্ত্রণ সবই এখানে। এই অঞ্চল দখলে থাকলে, গোটা আরব উপদ্বীপের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা যায়। ঠিক এই কারণে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, এমনকি ভারত পর্যন্ত ইসরায়েলকে সবধরনের সহায়তা দেয় অস্ত্র, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, কূটনীতি সবকিছু।

যুদ্ধের সূত্রপাত এখানেই ইহুদিরা বিশ্বাস করে, এ ভূমি কেবল তাদের, আর মুসলমানরা এখানে দখলদার। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, হাজার বছর ধরে মুসলমানরাই এখানে বসবাস করে আসছে, খিলাফতের শাসনব্যবস্থায় ইহুদিরাও নিরাপদেই ছিল। কিন্তু আজ, আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে শুরু হয়েছে এই দখলদারিত্ব। একে একে গ্রাম দখল, ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে হত্যা, নির্বিচারে গুলি, শিশুদের ওপর আগ্রাসন সবই তারা করে ধর্মের নামে, অথচ সত্যিকারের ধর্ম কোনো নিরপরাধ শিশুর রক্ত চায় না।

লেখক পরিচিতি: ইসতিয়াক আহমেদ খাঁন, একাদশ বিজ্ঞান
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

ভ্রমণকাহিনি

জাপানের পরিচ্ছন্নতা সংস্কৃতি ও আমাদের দায়বদ্ধতা

নিগার ইসলাম

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে একটি ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা পেয়েছিল। যেদিন জাপানের খেলা থাকে দেখা গেলো, খেলা শেষে জাপানি দর্শকরা গ্যালারি পরিষ্কার করে স্টেডিয়াম ত্যাগ করছেন। এরপর বিশ্বকাপে জাপানের প্রত্যেক ম্যাচে, এমনকি ম্যাচে হেরে গিয়েও কিংবা অংশগ্রহণ করেনি এমন ম্যাচেও জাপানিজ দর্শকদের ম্যাচ শেষে নিয়মিতভাবে স্টেডিয়াম পরিষ্কারের এই দৃশ্য দেখা যেতে লাগল। মাঠের খেলাগুলোতে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দর্শকরা অনেক কিছুই করেন। অনেকসময় দর্শকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনো শক্তিশালী বার্তা দিতে চান। জাপানিজরা যখন কোনো পাবলিক প্লেস বা সকলের জন্য উন্মুক্ত এমন স্থান ব্যবহার করেন, তখন তাঁরা "Clean as you go" নীতিতে চলেন। অর্থাৎ ব্যবহার করার সময় সেই জায়গার কোন পরিবর্তন না করার ব্যাপারে সচেতন থাকা, যতটুকু নোংরা হয় তা সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার করা এবং জায়গাটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে রেখে যাওয়া। ম্যাচ শেষে স্টেডিয়ামের গ্যালারি পরিষ্কার করার এই কাজ জাপানিজদের জাতিগত পরিচ্ছন্নতা-সংস্কৃতিরই প্রকাশ, যা তাঁরা সবসময়ই পালন করে আসছেন। এই ক্ষেত্রে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, বরং তাঁদের স্বভাবসুলভ দায়িত্ববোধ থেকেই কাজটি করেছেন। হয়তো এই প্রথমবার, এত বিশাল সংখ্যক মানুষ একসাথে এই কাজ করায় বিষয়টি সবার দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। দু'বছর জাপানে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে, জাপানিদের এমন অনেক অসাধারণ অভ্যাস এবং জীবন-যাপন পদ্ধতি আমার চোখে পড়েছে যা আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানের পরিচ্ছন্নতা সংস্কৃতির পেছনে জাপানিদের জাতিগত মূল্যবোধ ও এর গুরুত্ব তুলে ধরা।

জাপানে পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা শুরু হয় একেবারে শৈশব থেকেই। প্রি-প্রাইমারি এবং প্রাইমারি স্কুল থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত শিশুদের হাতে-কলমে শেখানো হয় পরিষ্কার- পরিচ্ছনতার ব্যাপারে। এই অভ্যাস ছোট থেকেই গড়ে ওঠায় বড় হয়েও এটি তাঁদের জীবনের স্বাভাবিক রুটিন হয়ে দাঁড়ায়। জাপানের স্কুলগুলোতে আলাদা পরিচ্ছন্নতাকর্মী থাকে না। প্রতিদিন দুপুরের খাবারের পরে ১৫ থেকে ৩০ মিনিট শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শ্রেণিকক্ষ, বারান্দা, বাথরুম, স্কুল প্রাঙ্গণ এবং মাঝে মাঝে স্কুলের সামনের রাস্তাও পরিষ্কার করে। এই সময় তাঁদের শিক্ষকগণ ও তাঁদের সহযোগিতা করেন। এমনকি বিশেষ অনুষ্ঠানের পুর্বে এবং পরে অভিভাবকগণ ও স্কুল পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা সেই "clean as you go" নীতির পাশাপাশি তাঁরা শিখে একজন নাগরিক হিসেবে তাঁদের দায়িত্ববোধ, সম্মান, সততা, বিনয় এবং শৃঙ্খলা।

জাপানে পরিচ্ছন্নতা শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা স্টেডিয়ামে সীমাবদ্ধ নয়। বড় শহরগুলোতে রাস্তায় কোনো ডাস্টবিন খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই বলে মানুষ ময়লা যেখানে- সেখানে অথবা রাস্তায় ফেলে না। তারা ময়লা নিজের ব্যাগে অথবা পকেটে নিয়ে ঘোরে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা ডাস্টবিন খুঁজে পায়। প্রয়োজনে বাসায় নিয়ে গিয়ে তাঁরা সেই ময়লা যথাযথভাবে ডাস্টবিনে ফেলে।

জাপানে বহুবার একটি দৃশ্য দেখেছি যে স্যুট-টাই পরা সুবেশিত ভদ্রমহিলা অথবা পুরুষ একজন ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজ হাতে তাদের দোকানের সামনের রাস্তা ঝাঁড়ু দিচ্ছেন অথবা আবর্জনা তুলছেন। দিনের প্রথমভাগে অফিস রুম অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি যখন খোলেন তখন তারা এই কাজটি করেন। এমন সুন্দর পোশাক পরা মানুষ রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছেন দেখে প্রথমে অবাক লাগলেও পরে বুঝেছি, জাপানে এটা একদম স্বাভাবিক। নিজে পরিচ্ছন্ন করা বা রাখাকে তারা কখনো নিচু কাজ মনে করেন না বরং না করাটাকে তারা নিচু কাজ মনে করেন। পরিচ্ছন্নতা তাদের কাছে ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক সচেতনতা প্রকাশের নিয়ামক।

আমার একজন জাপানিজ শিক্ষক যিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশে জাপানি ভাষা পড়াচ্ছেন, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা ঘরে বা বাইরে সর্বত্র এই পরিচ্ছন্নতার বিষয়টা এত সুন্দরভাবে কিভাবে মেনে চলেন? তিনি হাসিমুখে বলেছিলেন, "আমরা যেখানে থাকি কি ঘর আর বাহির, পুরোটাকেই নিজেদের থাকবার জায়গা হিসেবে বিবেচনা করি"। তাই আমরা চেষ্টা করি সেটা সংরক্ষণ ও পরিষ্কার রাখতে। সেই পরিবেশের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখতে। আরেকজন জাপানিজ বন্ধুকে ঠিক একই কথা জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিলো, "এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? আমি যদি নিজের প্রয়োজনে কোনো পাবলিক প্লেসের কোনো জায়গার কিছু পরিবর্তন করি, তাহলে সেটাকে আগের মতো করে ফেলা কি দায়িত্ব নয়?" আমি নিজে এসে সুন্দর পেয়েছি, আমার পরেরজনও কি এটাই প্রাপ্য নয়?

জাপানে ক্লাসরুম এ ক্লাস শেষে বা ক্লাস পার্টি শেষে বা ক্লাসে ছোটখাটো কোন অনুষ্ঠানেও আমি এই সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করেছি। যে কোনো অনুষ্ঠান শেষে ক্লাসরুম এমনভাবে পরিষ্কার করে রেখে আসতে হতো যে, যেন তা আগের চেয়েও বেশি ঝকঝকে দেখায়।

জাপানের পরিচ্ছন্নতা সংস্কৃতির পেছনে রয়েছে তাঁদের গভীর জীবন দর্শন ও মূল্যবোধ। এর মধ্যে দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দর্শন হচ্ছে "আতারিমায়ে" (当たり前) এই শব্দের অর্থ হচ্ছে "স্বাভাবিক", "প্রত্যাশিত", বা "অবশ্যকরণীয়"। জাপানিজরা মনে করে, রাস্তা বা কর্মস্থল পরিষ্কার রাখা কারো বিশেষ দয়া নয় বরং এটি প্রতিটি নাগরিকের স্বাভাবিক ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ হওয়া উচিত। আরেকটি জাপানিজ গুরুত্বপূর্ণ জীবন দর্শন হচ্ছে "মোত্তাইনাই" (もったいない)-এর অর্থ "অপচয় করা, লজ্জাজনক বা অনুতাপজনক"। এই দর্শনের ভিত্তিতে জাপানিরা খাবার, পানি, সময়, শক্তি এমনকি একটি কাগজের টুকরোও অপচয় করা থেকে বিরত থাকে। কারণ তারা বিশ্বাস করে, প্রতিটি সম্পদের প্রতি আমাদের সম্মান দেখানো উচিত। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ও কেনিয়ান পরিবেশকর্মী ওয়াংগারি মা'থাই "মোত্তাইনাই" এই শব্দটিকে আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী আন্দোলনে পরিচিত করে তুলেছিলেন।

শুধুমাত্র শিক্ষা, দর্শন অথবা সচেতনতার মাধ্যমে নয় জাপানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলবার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম-কানুন এবং প্রযুক্তিগত ইনোভেশন আছে। খুব সহজ একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুণ, বোতলে বা ক্যান-এ পেপসি খাওয়ার পর আমরা সাধারণত কী করি? কোনো চিন্তা না করেই ছুড়ে ফেলে দিই, তাই না? জাপানিরা কী করবে জানেন? প্রথমে তাঁরা আশপাশে কোথাও ডাস্টবিন আছে কি না খুঁজবে। যদি না পায়, তাহলে তাঁরা সেটা প্রথমে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে। এরপর যখন ডাস্টবিন খুঁজে পাবে, তখন কি ছুড়ে ফেলে দেবে? না। বোতলের মুখটা এক নির্দিষ্ট বিনে ফেলবে, বোতলের গায়ে যে স্যাশেট বা লেবেল থাকে তা আরেক জায়গায়, আর বোতলটা ফেলবে আলাদা আরেক বিনে। আর যদি সেটা ধাতুর তৈরি ক্যান হয়, তাহলে সেটার জন্য নির্দিষ্ট আরেকটি বিনে ফেলবে। অবাক হয়ে গেলেন? এবার আসুন দেখি, এই যে সবগুলো গার্বেজ তাঁরা আলাদা করল, কেনো করল?

প্রথমত, ময়লা যেখানে-সেখানে ফেলা হয়নি, ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয়নি এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রইল।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ময়লা আলাদা করে ফেলার ফলে এগুলোর কোনোটা চলে যাবে রিসাইক্লিং বা রিইউজের মাধ্যমে নতুন কোনো পণ্যে রূপান্তরের জন্য, আবার কোনোটা যাবে ইনসিনারেশন প্ল্যান্টে। যেখান থেকে ময়লা থেকে তাপ এবং সেই তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। মানে, বুঝতে পারছেন? যেটা আমরা "ময়লা" বলে ফেলতে যাচ্ছি, সেটা কীভাবে আবার একেকটি সম্পদে পরিণত হচ্ছে!

জাপানের নৈতিক শিক্ষা বইয়ে বাচ্চাদের শেখানো হয়-

'যদি তুমি ফেলো, তাহলে সেটা ময়লা; আর যদি তুমি সংরক্ষণ করো, তাহলে সেটা সম্পদ।'

জাপানে এসব দেখে প্রথমে অবাক হতাম, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছি, জাপানে এটাই স্বাভাবিক। এভাবে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে গিয়ে দেখি, এখন আমি চাইলেও আর যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলতে পারি না। নিজের দেশে এসেও পারি না।

আজ পৃথিবীর অনেক উন্নত এবং সচেতন জাতি শুধুমাত্র অর্থ, সম্পদ, প্রযুক্তিকেই উন্নতির চাবিকাঠি মনে করে না। তাঁরা এমন একটি পরিবেশ রেখে যেতে চায়, যেখানে তাঁদের ভবিষ্যত প্রজন্ম নিরাপদে, স্বাস্থ্যকরভাবে বেড়ে উঠবে। তাঁরা পরিবেশকে ধ্বংস না করে বরং তা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, আমরা আমাদের দেশের মাটি, পানি, বাতাস সবকিছুই নিজের হাতে ধ্বংস করছি।

খাবারে বিষাক্ততা, পানি দূষণ, যত্রতত্র ময়লা এবং প্রায় তিন বছর ধরে তালিকায় প্রথম স্থান অর্জনকারি দুষিত বায়ুর দেশ আমরা। সৌন্দর্যবোধ তো অনেক পরের ব্যাপার। সুন্দর একটি জায়গায় ঘুরতে গিয়ে যত্রতত্র ময়লা ফেলে তার সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট করতে আমাদের মতো পারদর্শী আর কেউ নেই। আমার ব্যবহার হয়ে গেছে, পরে কার কী হলো, তা ভাবা আমার দায়িত্ব নয়, এই মনোভাব নিয়ে আমরা জীবন-যাপন করি। আমরা যদি সত্যিই আমাদের সন্তানদের জন্য একটি উন্নত, নিরাপদ ও বাসযোগ্য একটি দেশ দেখতে চাই, তাহলে প্রথম পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে নিজেকে দিয়ে। ময়লা-আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলা, খাবার অপচয় না করা, গাছ লাগানো, প্লাস্টিক বর্জনের বিকল্প ব্যবহার, এসব ছোট ছোট পদক্ষেপই বড় পরিবর্তনের পথ তৈরি করে।

জাপানিরা উন্নত তাঁদের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার জন্য নয় বরং প্রতিটি ছোট কাজকে সম্মান করে দায়িত্ববোধের সাথে পালন করবার জন্য আজকে তাঁরা এতো উন্নত। জাপানের মতো দেশে পরিচ্ছন্নতা শৈশব থেকেই শিক্ষা ও অভ্যাসের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমাদের সমাজে এই দায়িত্ববোধের অভাব স্পষ্ট, যা শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ বা আইন দিয়ে পূরণ সম্ভব নয়। আমাদেরও পরিবেশ রক্ষাকে দায়িত্ব ও অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ দিয়ে যদি দেশকে ভালোবাসতে শুরু করি, তবেই নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বেঁচে থাকবার জন্য একটি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারব।

লেখক পরিচিতি: নিগার ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

ভ্রমণকাহিনি

আটলান্টিকের ওপারে

মো: নাহিদ আনদালিব

রাত ৮.৩০ মিনিট, ফার্মগেট এলাকায় যানজটে পড়েছি। একপর্যায়ে যানজট কাটিয়ে আমাদের গাড়ি উড়াল সেতুতে উঠে পড়ল, উদ্দেশ্য ঢাকা শাহজালাল এয়ারপোর্ট। টিকিট কাটার সময় ট্রাভেল এজেন্সি আমাদের জানিয়েছিল আমরা যেন রাত দশটায় এয়ারপোর্টে পৌছায়, অবশেষে রাত দশটার কিছু আগে এয়ারপোর্টে পৌছালাম। আজ আমাদের গন্তব্য পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতি ও পরাক্রমশালী রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের বলছি কারণ আমার সাথে সফর সঙ্গী হিসাবে আছে আমার স্ত্রী ও কন্যা। ইতিপূর্বে বিমান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে শুধু আমার ও আমার স্ত্রীর, কারণ আমি তখন বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য কোম্পানির হেড অফিসে অ্যাডভ্যাটাইজমেন্ট এন্ড ক্রিয়েটিভ বিভাগে চাকরি করতাম তখন চাকরি সুবাধে কোম্পানি একবার আমাকে স্বপরিবারে কক্সবাজারে বিনোদন ভ্রমণে পাঠিয়েছিল, তবে সে অনেকদিন আগের কথা। যাই হোক এয়ারপোর্টের টার্মিনালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা ও লাগেজ বুকিং শেষ করে আমরা বিমানে উঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের ফ্লাইট সিডিউল ছিল এমিরেটস এয়ারলাইন্স এর রাত ১.৩০ মিনিট। এবার আমাদের অপেক্ষার প্রহর যেন দীর্ঘ হতে চললো, মনে হতে লাগলো কখন বিমানে চড়বো, সামনে একটি নতুন দেশ দেখার হাতছানি, একটা আলাদা শিহরণ। মনে হতে লাগলো শুরুতে অনেকটা অবহেলার সাথে আমেরিকা যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম, যেদিন আমাদের আমেরিকান দুতাবাসে ইন্টারভিউ এর জন্য ডেট ছিল সেদিন ঐ দুতাবাসের ইন্টারভিউ দিতে আসা লোকজন ও তাদের পূর্ব প্রস্তুতি দেখে আমার মনে হয়েছিল আমেরিকার ভিসা আমার পাওয়া সম্ভব না। আমি সেদিন আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম হতাশ হওয়ার দরকার নেই কারণ এই ভিসা পাওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিতে যারা এসেছে তাদের মত প্রস্তুতি আমাদের নেই। যাইহোক আমরা কিন্তু সেদিন খুব সহজেই স্বপরিবারে আগামী পাঁচ বছরের জন্য আমেরিকার মাল্টিপোল ভিসা হাতে পাই। সেই সাথে মনের মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাসের জন্ম নেয়। হঠাৎ করে এয়ারপোর্টের লাউড স্পিকারে দুবাইগামী বিমানের যাত্রীদের বিমানের উঠার চুড়ান্ত ধাপে একটি আলাদা টার্মিনালে প্রবেশ করতে বললে আমরা সেখানে যেয়ে আমাদের হ্যান্ড লাগেজসহ অন্যান্য জিনিস মেশিনে পরীক্ষাপর্ব শেষ করে অপেক্ষা করতে থাকলাম, আর ভাবতে থাকলাম কখন বিমানে উঠবো। আমি কি সত্যিই আমেরিকা যাচ্ছি? জীবনে কতবার যে ডিভি লটারির আবেদন করেছিলাম, আমার ভাগ্যে সেই সুযোগ আসেনি। হলিউডের সিনেমা দেখে এই দেশ দেখার একটা মনোবাসনা চিরকাল ছিল কিন্তু কোনদিন কাউকে বলতে পারিনি পাছে কেউ যদি আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে এই ভেবে। যাইহোক আমার আশেপাশে যারা যাত্রী হিসাবে অপেক্ষা করছিলো তারা প্রায় সবাই বাংলাদেশি ও মধ্যপ্রাচ্যের যাত্রী, হাতেগোনা কয়েকজন হয়তো আমেরিকাগামী যাত্রী হতে পারে। দুবাই এয়ারলাইন্স এর একজন স্টাফ আমাদের সামনে এবার ঘোষণা করলেন বিমানে যাত্রীদের মধ্যে প্রথমে প্রবেশ করবে বিজনেস ক্লাসের যাত্রীগণ, সেই সাথে বয়স্ক, বিকোলাঙ্গ, অসুস্থ ও ১২ বছরের নিচের শিশু ও তাদের অভিভাবকগণ। আমাদের টিকিট ছিল ইকোনমি ক্লাসের। জানালার দিকে সিটের প্রত্যাশা ছিল, বিমানের ভিতরে প্রবেশ করে সেই কাঙ্ক্ষিত সিট পেয়ে গেলাম। বিমানটি ছিল বোয়িং এর অত্যাধুনিক ট্রিপুল সেভেন জেট মডেলের বিমান। পাইলট যাত্রার শুরুতে আমাদের বেশ কিছু নির্দেশনা দিলেন এবং বিমান রানওয়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো এবং নীল আকাশের দিকে ছুটে চলল, আমি এই প্রথম আমার মাতৃভূমি ত্যাগ করে স্বপ্নের দেশ আমেরিকার দিকে ছুটে চললাম।

বিমানের প্রত্যেকটি সিটের পিছনে একটি করে মনিটর ছিলো, সেই মনিটরের দিক নির্দেশনা মতে বুঝতে পারলাম বিমানটি ভারতের কলিকাতা, নাগপুর, ভূপাল, হায়দারাবাদ এর উপর দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে করাচির উপর দিয়ে একপর্যায়ে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে দুবাই পৌছাবে। সিটে মাথাটি এলিয়ে দিতেই সুদর্শনা ও পরিপাটি পোশাক পরিহিত বিমানবালাদের ট্রেতে করে হরেক রকমের খাবার পরিবেশন করতে দেখলাম। তাড়াহুড়া করে বিমানের উঠার কারণে রাতে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করে উঠা হয়নি। চিন্তা করলাম বিমানের খাবার শুনেছি খুব মুখোরোচক ও বৈচিত্রপূর্ণ সুতরাং যাত্রাকালে বিমানের খাবার খেয়েই ক্ষুধা নিবারণ করবো। যখন আমার সামনে ট্রেতে করে বিভিন্ন রকম খাবার পরিবেশন করা হলো আমি খুব আগ্রহের সাথে খাবার মুখে দিলাম আর হতাশ হলাম, কোথায় আমার পরিচিত খাবারের স্বাদ ? একের পর এক খাবার মুখে দিলাম কিন্তু কোন খাবারের মধ্যেই স্বাদ খুঁজে পেলাম না। যাই হোক এভাবে প্রায় ৫ ঘন্টা ২৫ মিনিট বিমানটি একনাগাড়ে চলার পর দুবাই এর আকাশে প্রবেশ করলো, অবশ্য এর মধ্যে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য তিন বার খাবার পরিবেশন করলো। দুবাই এর আকাশে কয়েকবার

বিমানটি চক্কর দেবার পর যখন ল্যান্ড করলো তখন স্থানীয় সময় ভোর চারটা। বিমানটি থেকে যখন আমরা বের হলাম তখন বাহিরে কনকনে ঠাণ্ডা। আমরা যখন দুবাই এয়ারপোর্টের লাউন্সে প্রবেশ করলাম তখন মনে হলো এটি কোন এয়ারপোর্ট নয় বরং একটা বিরাট শপিং মল। চারিদিকে চোখ ধাঁধাঁনো আলোক ঝলকানি আর দামি সব পণ্যে ভরা দোকান। প্রতিটি দোকানের পণ্যসমূহ ছিল শুল্ক মুক্ত। দুবাই এয়ারপোর্টে ফ্রি ওয়াইফাই ইন্টারনেট ব্যবস্থা ছিল। মেহেরপুর সরকারি কলেজের দর্শন বিভাগের মনিরুল ইসলাম স্যার হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে আমার কুশলাদি জানলেন এবং মনে সাহস যোগালেন। ভালো লাগলো আগে তো কখনো এভাবে বিদেশ যায়নি, মনে এক ধরণের ভয় কাজ করছিল। যাই হোক দুবাই এয়ারপোর্টে সাড়ে চার ঘন্টা যাত্রা বিরতির পর আমরা সেখানে নতুন ভাবে ইমিগ্রেশন শেষ করে নতুন একটি লাউন্সে প্রবেশ করলাম, এখানে আমার সহযাত্রী প্রায় সবই ইউরোপিয়ান, তাদের কিছু ছিলো আফ্রিকান, ছিলো অ্যারাবিয়ান,এশিয়ান ও

স্পানিশ। নানা ধর্মের ও বর্ণের লোক ছিলো সেখানে। এবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো বোয়িং এর A380 এয়ারবাস এর মাধ্যমে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ দ্বিতল বিমান A380 এয়ারবাস, এই বিমান একবারে গড়ে ৫২৫ যাত্রী বহন করতে পারে, এর সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৮৫৩ জন। বিশাল আকারের এই বিমানটির দৈর্ঘ্য ২৩৮ ফুট, যা একে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী বিমানের মর্যাদা দিয়েছে। যার উপরিভাগ সম্পূর্ণ বিজনেস ক্লাস আর নিচে ছিল ইকোনমি ক্লাস। আমরা ছিলাম ইকোনমি ক্লাসের যাত্রী। বিমানটি ছিল খুবই সুসজ্জিত ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরী। যাত্রী সেবার মানে বিমানটি অতুলনীয় হবার পেছনে রয়েছে এর উন্নত অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন, আধুনিক কেবিন প্রেসার প্রযুক্তি, প্রশস্ত জানালা। সব মিলিয়ে অসাধারণ এক বিমান। এবার যাত্রার শুরুতে পাইলট যাবতীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে বিমানটির যাত্রা শুরু করলেন, বিমানটি রানওয়ে থেকে উচ্চগতিতে উড্ডয়ন করে আকাশে উড়ে গেল। আগেরবারের মত আমাদের সামনে একটি খাবার মেন্যু দেওয়া হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে খাবার পরিবেশিত হলো, একটা কথা বলে নিই আমার কিন্তু পেটে ছিলো প্রচন্ড ক্ষুধা কারণ পূর্বের বিমানের খাবার বিস্বাদ থাকার কারণে আমি খেতে পারিনি। আমি খেয়াল করলাম A380 এয়ারবাস এর খাবার পরিবেশনের পূর্বে তারা শিশু ও কিশোর, কিশোরীদের খাবার প্রথমে পরিবেশন করলো তারপর তারা অন্যদের খাবার পরিবেশন করতে লাগলো, আমি পূর্বের ন্যায় এবারো খুব আগ্রহের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য প্যাকেট খুললাম, কিন্তু হায়! এই খাবারো ছিল পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন সাধের। আমি একের পর এক প্যাকেট খুললাম কিন্তু কোন খাবারেই কোন পরিচিত সাধ পেলাম না। খাবারগুলো ছিল মানসম্মত এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তবে আমরা যে ধরণের খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত এই খাবার ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেকটা হতাশ হয়ে বিমানবালার নিকট ফলের জুস খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম, বিমানবালা যে জুস পরিবেশন করলো সেই জুসের স্বাদ আমাদের দেশের জুসের মত এত মিস্টি স্বাদের ছিল না, পরে বুঝলাম আসলে আমরা ছোটবেলা থেকে ভেজাল খেতে খেতে আসল খাবারের স্বাদ খুঁজে পাচ্ছিনা। যাই হোক এয়ারবাস A380 তার শক্তিশালী ৪টি টার্বোফ্যান ইঞ্জিন এর মাধ্যমে উচ্চ গতিতে গন্তব্যে দিকে ছুটে চলছিল, যাত্রাপথে আমরা দুবাই হতে সৌদিআরব, মিশর, লিবিয়া আলজেরিয়া, মরক্কো হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে এসে পৌছালাম। পাইলট কিছুক্ষণ পর পর মাইক্রোফোনে বাতাসের গতি সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছিলেন ও সিটবেল্ট বাঁধার পরামর্শ প্রদান করছিলেন। আমি খেয়াল করলাম এয়ারবাস A380 এর মতো ভারী বিমানও ঝাকুনির মধ্যে পড়ছিল বার বার। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে আমাদের দীর্ঘ ৮ ঘন্টা সময় লেগেছিল। মনের মধ্যে শিহরণ জাগছিলে কখন আমেরিকা পৌছাবো কিন্তু দীর্ঘবিমান যাত্রা আমাদের আনন্দকে বেদোনায় রুপান্তরিত করছিল বারবার। সম্ভবত আমরা ভূপৃষ্ট হতে প্রায় ৩২০০০ হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ছিলাম তাই আমাদের বার বার কান বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, আমার মেয়ের কানে ব্যাথা দেখা দেওয়ায় সে কান্না করছিলো। আমরা কেবিন বয় কে জানালে সে ডাক্তার ও ওষুধ এর ব্যবস্থা করে। বিমানের অন্য ক্রুরা আমাদের হ্যাপি মোমেন্ট এর একটি ছবি তুলে স্বয়ংক্রিয় প্রিন্ট করে দিলো। বিমান ক্রুদের এমন আচারণে আমার খুব ভালো লাগলো। একটা কথা বলে নিই আমি আমাদের বিমান যখন বাংলাদেশ থেকে যাত্রা শুরু করে তখন থেকে আমাদের বাংলা ভাষার ব্যবহার শেষ হয়ে গিয়েছিলো আমি তখন বাধ্য হয়ে ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম, শুরুর দিকে হঠাৎ করে কিছুটা অস্বস্তি মনে হলেও ধীরে ধীরে সাবলীল হয়ে গেলাম, মনে হচ্ছিল কেন যে আগে আমেরিকা যাইনি। তবে ইংরেজি বলার চেয়ে অপরের ভাষা বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল কারণ তাদের উচ্চারণ ছিল কিছুটা জড়ানো। এয়ারবাস A380 এবার চলে আসলো স্বপ্নের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর আকাশ সীমানায়, কিছুক্ষণের মধ্যে এটি চলে আসলো নিউইয়র্ক এর আকাশে। আমি জানালা দিয়ে

নীচে দেখতে থাকলাম, সারি সারি সুউচ্চ দৃষ্টিনন্দন ভবন, নীচে বৃহৎ রাস্তার মধ্যে চলমান গাড়ির সারি, সুপরিকল্পিত এক শহর। আমাদের প্লেন একনাগাড়ে দীর্ঘ ১৪ ঘন্টা ২৫ মিনিট চলার পর নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে ল্যান্ড করলো। বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশন অফিসার যাত্রিদের অনেক প্রশ্ন করছিল, যারা আমেরিকার নাগরিক তাঁদের লাইন ভিন্ন কিন্তু যাঁরা আমেরিকার নাগরিক নন তাঁদের অনেক প্রশ্ন করা হয় যদি তাঁরা আমেরিকা প্রবেশের সঠিক কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারেন তাঁদের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন অফিসার যদি সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে ফিরতি ফ্লাইটে বিমান বন্দর থেকে তাঁর নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যাইহোক ইমিগ্রেশন আফিসার আমাকে খুব একটা প্রশ্ন করলেন না, শুধু বললেন আমি আমেরিকাতে কোথায় থাকবো, কত টাকা সঙ্গে এনেছি, পরিশেষে মুচকি হেসে একটা ধন্যবাদ দিয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমি আমার ল্যাগেজ সংগ্রহ করে বিমান বন্দরের বাহিরে এসে দেখলাম আমার শ্যালিকা সুম্মা সোহানী তার পরিবারসহ গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য আপেক্ষা করছে, কি যে এক আবেগ অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। আমরা নিউইয়র্ক থেকে নিউজার্সিতে তাঁদের বাড়িতে গেলাম। আমি পরিবারসহ এক মাস একুশ দিন আমেরিকাতে ছিলাম। আমার শ্যালিকার শ্বশুরবাড়ির প্রায় সব আত্নীয় আমেরিকাতে থাকে, তারা খুবই আন্তরিক, তাদের ব্যবহার আচরণ ভুলা যাবে না। তাঁদের প্রত্যেকের বাসায় আমাদের একাধিকবার আপ্যায়িত করা হয় এবং সেখানে দেশীয় ও আমেরিকান খাবার পরিবেশন করা হয়। আমেরিকার জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল তবে তাঁরা সকলে খুবই পরিশ্রমী, তাদের আজকের এই সাফল্যের পিছনে দেখেছি কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তীতা। আমেরিকানদের কাছে কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি, অহেতুক সময় নষ্ট করা তারা পছন্দ করে না। আমি আমার এই ৪১ দিনের সফরে কখনো দেখিনি কাজ ছাড়া কোন মানুষকে রাস্তায় বা কোন দোকানে অহেতুক আড্ডা দিতে। আমেরিকার স্কুলগুলিতে খেয়াল করলাম তাদের সিলেবাস ও মুল্যায়ণ পদ্ধতি যুগপোযোগী, শ্রেণিকক্ষেই এমনভাবে পড়ানো হয় যে একজন শিক্ষার্থীর বাড়িতে খুব একটা বেশি পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। এখানকার মানুষ পরস্পররে প্রতি খুব বেশি শ্রদ্ধাশীল, সমাজের যে কোন পেশাকে মানুষ সম্মান দেখায়। উৎসবের সময় আমেরিকায় খাবারসহ আনুষাঙ্গিক জিনিসের দাম কম রাখা হয় উদ্দেশ্য মানুষ যেন বেশি পরিমাণ দ্রব্য কিনতে পারে। দৃশ্যটি দেখে আমাদের দেশের বাজার ব্যবস্থার কথা ভাবছিলাম কারণ এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় বাংলাদেশে। আমেরিকার চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই আধুনিক এবং ইনস্যুরেন্স নির্ভর। হাসপাতালগুলো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত ও খুবই পরিস্কার পরিছন্ন। সকল নাগরিক বাধ্যতামুলকভাবে ইনস্যুরেন্স এর আওতায় থাকতে হয় ফলে প্রতি তিন মাস পরপর প্রতিটি নাগরিককে হেলথ চেকআপের জন্য হাসপাতালে যেতে হয় এবং তাদের প্রয়েজনীয় যে কোন ধরণের চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফ্রি প্রদান করা হয়। এখানকার মানুষেরা পশুপাখির প্রতি খুবই যত্নশীল, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পশুপাখিদের জন্য আলাদা খাবারের স্টল দেখতে পেলাম এবং এই সকল স্থানে তাদের বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী খাবারের প্যাকেট দেখতে পেলাম। এই সকল পশুপাখিদের প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা প্রশিক্ষক ও চিকিৎসক রয়েছে, পশুপাখিদের প্রতি তদের এত আয়োজন দেখে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কথা মনে পড়ছিল আর ভাবছিলাম সামান্য টাকার অভাবে কিভাবে আমাদের দেশের মানুষ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। আমেরিকায় সাধারণ মানুষের জন্য আর্থিক, সামাজিক, ধর্মীয়সহ সকল ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। একজন সাধারণ আমেরিকান নাগরিকের জন্য জীবনের শুরু থেকে যেমন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রয়েছে তেমনি জীবনের শেষ সময়ে তাদের যেন অপরের মুখাপেক্ষি না হতে হয় তার জন্য রাষ্ট্র সকল রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছে আর এই কারণে সে দেশের নাগরিকদের অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কথা ভাবতে হয় না। আমেরিকানরা খুবই সুপরিকল্পিতভাবে তাদের দেশকে তৈরী করেছে তাই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠদেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে নিজেদের পরিচিত করতে পেরেছে আর এর পিছনে রয়েছে সে দেশের রাজনীতিবিদদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও জনগণের দেশাত্ববোধ। চাকুরির ছুটি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অল্প সময় আমেরিকাতে অবস্থান করেছিলাম, এই সময়ে আমি মাত্র তিনটা স্টেটে ভ্রমণ করতে পেরেছিলাম, মহান রাব্বুল আলামিন যদি সহায় হন আগামী বছর গ্রীষ্মে আমেরিকার অন্যকোন স্টেটে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। দেশে ফেরার সময় আমি কাতার হয়ে এসেছিলাম, আরও একটি দেশ দেখতে পেলাম যা আমার স্মৃতির মণিকোঠায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক পরিচিতি: মো: নাহিদ আনদালিব
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

ভ্রমণকাহিনি

সিঁড়ি, সাগর আর একাকীত্বের গল্প

মো. শিহাব হাসান

প্রায় মধ্যরাত। চারিদিকে ঝিঁঝি পোকার গান, আকাশে এক ফালি নির্মল চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি। গ্রীষ্মের দক্ষিণী ঝিরঝিরে হাওয়া- এক অন্যরকম অনুভূতি। এই অনুভূতিকে সঙ্গী করে আনন্দের সাথে গুছিয়ে নিচ্ছি ব্যাকপ্যাক। কারণ আগামীকাল শুরু হবে আমার স্বপ্নের সোলো ট্রিপ- সীতাকুণ্ড, কক্সবাজার ও টেকনাফ। পাহাড়, সমুদ্র আর চাঁদ আমাকে ডাকে কোনো অদৃশ্য মায়ায়। ব্যাকপ্যাক গোছানো শেষে বালিশে মাথা রেখে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গেলাম। কখন ঘুম এসে জড়িয়ে নিল, টেরও পাইনি। ভোর ৫টা। ফোনের অ্যালার্ম বেজে উঠল- কিরিং-বিরিং! অন্যসময় অ্যালার্মে বিরক্ত হলেও আজ শুধু উত্তেজনা কাজ করছে। রেলস্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে চড়ে বসলাম। জানালা দিয়ে দেখা যায় দিগন্তজোড়া সবুজ-সোনালী মাঠ। মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি যেন আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে...সীতাকুণ্ডে পৌঁছে প্রথম গন্তব্য চন্দ্রনাথ পাহাড়। চূড়ায় উঠতে হবে প্রায় ১২০০ ফুট উচ্চতায়, সিঁড়ি প্রায় ৩৩০০টি! মাত্র ৪০০ সিঁড়ি অতিক্রম করেই হাঁপিয়ে পড়লাম। সিঁড়িগুলো যেন জীবনের ধাপ একটা পার হলে আরেকটা দেখা যায়। পাহাড়ের ভাজে এক কিশোরী লেবুর শরবত বিক্রি করছে। ২০ টাকার বিনিময়ে এক গ্লাস লেবুর শরবত দিয়ে সে বলল "ভাইয়া ধীরে ধীরে উঠবেন পাহাড় তাড়াতাড়ি কাউকে নিজের রহস্য জানান দেয় না।" শরবতের স্বাদে দেহটা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল। আবার সিঁড়ি অতিক্রম শুরু করলাম। পাহাড়ের সবুজ বৃক্ষলতা, বানরের উউ....উউউউ... ডাক, পাখির কিচিরমিচির শব্দ উপভোগ করতে করতে কাঁপা পায়ে সিঁড়ি অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় এগিয়ে যেতে থাকলাম। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শরিফ স্যারের একটা কথা মনে পড়ল "বয়স থাকতে ভ্রমণ করো, নইলে বৃদ্ধ বয়সে আফসোস করবে।" সত্যিই তো, বৃদ্ধ বয়সে কি পাহাড়ে উঠা সম্ভব? কপালের ঘাম আর পায়ের ঘাম এক করে চন্দ্রনাথের চূড়ায় পৌঁছালাম-নিমিষেই সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গেলাম। নিচে দেখা যাচ্ছিল পুরো শহর, সবুজের সমারোহ, আর দূরে সমুদ্রের নীলরেখা যেন স্বর্গের খণ্ডাংশ। চূড়াতে সনাতনীদের তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ মন্দিরের পাশে বসে ভাবছিলাম, "আসলেই সময়, অর্থ আর শক্তি কখনোই একসাথে ধরা দেয় না।"

পরদিন ভোরে কক্সবাজার বিচে সূর্যদয় দেখার অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। তখন সমুদ্র যেন রুপালি চাদরে মোড়া। সূর্য্যদয় শেষে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রের ঢেউয়ে। চিৎকার করে মনের সব আক্ষেপ দুঃখ-কষ্ট সমুদ্রের নোনা জলে ভাসিয়ে দিলাম। দু:খ-কষ্ট ভাসাতে গিয়ে কখন যে পছন্দের সানগ্লাসটা ভেসে গেল টেরই পেলাম না। বেলা দুইটায় ছাদখোলা জিপে চড়ে বসলাম টেকনাফের পথে। হিমছড়ি পাহাড়ের কাছে গাড়ি থামালাম এ-যেন আরেক রহস্যময়ী। একদিকে সবুজ-ধূসর পাহাড়ের সারি, অন্যদিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি আর তার গর্জন। এবার মেরিন ড্রাইভের পথ ধরে এগিয়ে চললাম টেকনাফ জিরো পয়েন্টের দিকে। মেরিন ড্রাইভের পথটা জীবনের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা। একপাশে অসীম সমুদ্র, অপর পাশে উঁচু-নিচু পাহাড়। মনে হলো, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর সৌন্দর্যের ৯০ ভাগ সৌন্দর্যই পাহাড়, সমুদ্র আর নারীর মাঝে ঢেলে দিয়েছেন। সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের স্নিগ্ধ ছোয়ায় এক অভুতপুর্ব প্রশান্তি অনুভব করতে করতে একাকী ছুটে চললাম। একাকী বলা ভুল হবে অবশ্য। কারণ ভ্রমণকারীরা সম্পূর্ণ একা হয় না কখনো, কারণ প্রকৃতি তাদের সঙ্গ দেয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে পৌঁছালাম টেকনাফ বিচে। সচক্ষে সাগরের বুকে সুর্যকে বিলীন হতে দেখলাম। এ যেন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সূর্যস্ত-সুর্যদয়ের মত মানবজীবনও ক্ষণদীপ্তিময় সৌন্দর্য ও বেদনায় মিশে থাকা আবরণ এবং এক অনিবার্য সমাপ্তির দিকে ধাবিত। কিন্তু এই সমাপ্তিই তো নতুন শুরুর ইঙ্গিত দেয়, যেমন সাগর সূর্যকে গ্রাস করেও ফিরিয়ে দেয় নতুন ভোরের আলোরূপে। সন্ধ্যা শেষে অন্ধকার নেমে আসলো সেই সাথে জ্বলে উঠল মিটিমিটি তারা। একফালি চাঁদ উঁকি দিল মেঘের আড়াল থেকে। ভেজা বালিতে পা গুজে চাঁদকে বললাম– "তুমি যেমন একাকী ঝলমলে, /নিসঙ্গ রাতের বুকে/ নীরবে আলো ছড়াও/ তেমনি একাকী মানুষও/ অন্ধকারে জ্বলে, /নি:শব্দে দেখে পৃথিবীর সুখ। /তুমি জানো না কেউ তোমাকে চায় কি না!/তবুও আলো ছড়াও/মানুষও ভালোবাসে নিরবে/যদি কেউ না ফেরে তার ডাকে।/এই তো একাকীত্বের মহিমা;/ নি:শব্দে দান, নি:শব্দে জ্বলা/আর নিজের আলোয়/পথ হারানো পথিককে/ একটু আশা দেওয়া।"

চাঁদের সাথে কথা বলতে বলতে রাত বাড়তে লাগল এবার ফেরার পালা। ফেরার পথে ট্রেনে বসে ডায়রিতে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশ বিদেশে' ভ্রমণ কাহিনির চরণটির পুনরাবৃত্তি করলাম-

"ভ্রমণ শেষ হয় না, শুধু বিরতি নেয়।
আজ আমি যে স্মৃতিগুলো সংগ্রহ করেছি,
সেগুলো আজীবন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে..."

জীবন মানেই শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা নয়। জীবন হলো দায়বদ্ধতা, আবিষ্কার করা আর নিজেকে হারিয়ে ফেলা সৃষ্টির অপার মহিমায়। "পৃথিবীকে দেখতে হবে, জানতে হবে। অজস্র স্মৃতি সংগ্রহ করতে হবে। হয়ত, জীবনের ক্রান্তিলগ্নে এই স্মৃতিই সঙ্গী হবে।"

লেখক পরিচিতি: মো. শিহাব হাসান, শ্রেণি: অনার্স ২য় বর্ষ, বিভাগ: রাষ্ট্রবিজ্ঞান
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

কবিতা

ভোর প্রকৃতির বুকে

উলমাতুন নেছা পূর্ণিমা

হঠাৎ আমার ভেঙেছে ঘুম কোকিলের কুহুতানে,
তখন যে ভোর তিন সাড়ে তিন দেখি ঘড়ির পানে।
দরজা খুলে বাইরে আসি ভোর প্রকৃতির বুকে,
নিঝুম রাতের শেষ প্রহরে ঘুমায় সবই সুখে।

পশ্চিমে চাঁদ একলা জেগে গাইছে ঘুমের গাঁথা,
বুকের মাঝে ধরে হাজার নিঃসঙ্গতার ব্যথা।
জাগলে সবে ঘুমুবে সে ঝরবে সোনা আলো,
রক্ত জবা পুব আকাশে মুছবে আঁধার কালো।
মিটিমিটি তারার ছোঁয়া আমার অনুভবে,
সত্যি যেন স্বপ্ন রেখে হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

ভোরের জোনাই পাকুড় শাখে আলোর মালা গাঁথে,
ভাবনাগুলো যায় হেঁটে যায় মনের খোলা পথে।
ঘড়ির কাঁটার হাতটি ধরে সময় হেঁটে চলে,
সময় তালে কাটে আঁধার ছোট্ট গ্রামের কোলে।
রক্ত জবা পাপড়ী মেলে পাখির ডাকাডাকি,
দুর নীলিমার নীলের পরশ হৃদয় ভরে মাখি।
ভোর রজনী হারায় দূরে আঁধার গেছে টুটে,
সূর্যি পানে তাকিয়ে এক সূর্যমুখী ফোটে।

লেখক পরিচিতি: উলমাতুন নেছা পূর্ণিমা
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৭১০
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

জ্ঞানের দীঘি

সামিয়া আক্তার

বইয়ের পাতায় পাতায় আলো
মনের দ্বারে টোকা,
যতই পড়ি ততই দেখি,
জ্ঞান কি থামে কোথা?
বন্ধুর মতো বইটা আমার
সব কথা যে শোনে...!
একলা রাতে পাশে এসে,
ভাবনার বাতি জ্বালে।
বইয়ের ভাষায় ভাবের ঘ্রাণ,-
অক্ষর যেন সুর।
পড়াশোনার আঁধার রাতে
জ্বলে জ্ঞানের নূর।

লেখক পরিচিতি: আমিয়া আক্তার
শ্রেণি: একাদশ, মানবিক বিভাগ
ৎমেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

কবিতা

তোমার শহরটা আজ কেমন আছে?

মো. রাফি উদ্দিন

তোমার শহরটা আজ কেমন আছে? কেমন আছে মানুষগুলো?
কেমন আছে তিন রাস্তা, কেমন আছে পথের ধুলো?

কেমন আছে হাইস্কুল মাঠ? কেমন আছে মহিলা কলেজ রোড?
কেমন আছে সরকারি কলেজ মাঠ, কেমন আছে শহীদ
শামসুজ্জোহা পার্ক?
কেমন আছে বিজনবিল আর মুজিবনগর রোড?
কেমন আছে রাস্তা জুড়ে বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড?

জলপাই রঙের বাড়িটা কি আগের মতই আছে?
এখনো কি হলদে পাখি বাসা বাঁধে, জারুল গাছে?
কেমন আছে ঝুলবারান্দা আর জানালার গ্রিল?
এখনো কি ওই আকাশে অবেলায় ওড়ে শঙ্খচিল?

এখনো কি টমকে নিয়ে হাটতে বের হও বিকেলবেলা?
এখনো কি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফুসকাওয়ালা?
এখনো কি বইমেলাতে জীবনানন্দের পদ্য খোঁজো?
এখনো কি ঝুমবর্ষায় ছাদের কোলে একলা ভেজো?

আমার দেওয়া চিরকুট খানা তোমার কাছে কেমন আছে?
এখনো কি লুকিয়ে পড়ো হুমায়ুন স্যারের বইয়ের ভাজে?
অঞ্জন দত্তের গান কি শোনো উদাস করা মেঘলার দিনে?
এখনো কি ফুসকা খাও পাড়ার শেষ গলিটার টং দোকানে?

কেমন করে কাটছে তোমার নিঝুম রাতের একলা প্রহর?
জানতে বড় ইচ্ছা হয়, কেমন আছে তোমার শহর?

লেখক পরিচিতি: মো: রাফি উদ্দিন
অর্থনীতি বিভাগ
মেহেরপুর সদর মেহেরপুর।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর
অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

মো: খেজমত আলি মালিথ্যা
সহযোগী অধ্যাপক (ইনসিটু)
বাংলা

মঈনুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা

সানজিদা ফেরদৌস
প্রভাষক
বাংলা

মো: মনিরুজ্জামান
প্রভাষক বাংলা

নিলুফার ইয়াসমিন
প্রভাষক
বাংলা

মোহা: হাসানুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজি

মাহামুদা পারভীন
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজি

মিলন মন্ডল
প্রভাষক
ইংরেজি

মনিরুজ্জামান
প্রভাষক
ইংরেজি

মীর মো: মাহফুজ আলী
প্রভাষক
ইংরেজি

মো: ফুয়াদ খাঁন
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বশির আহাম্মেদ
সহকারী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

মো: ইমরান ফরহাদ
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোছা: রুবাইয়া জান্নাত
প্রভাষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মো: হাবিবুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
অর্থনীতি

ড. সঞ্জয় বল
সহকারী অধ্যাপক
অর্থনীতি

মো: জাফর ইকবাল
প্রভাষক
অর্থনীতি

মো: এনামুল হক
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন

মো: মনিরুল ইসলাম
প্রভাষক
দর্শন

মো: তারিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মো: কাউছার আলী
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মো: নাহিদ আনদালিব
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মো: তৌফিকুল ইসলাম
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মামুন খান
সহকারী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান

দুর্জয় বৈরাগী
সহকারী অধ্যাপক (ইনসিটু)
হিসাববিজ্ঞান

মো: রফিকুল ইসলাম
প্রভাষক
হিসাববিজ্ঞান

আফরোজ মেহরুবা
সহযোগী অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা

মুন্সী এ.এইচ.এম. রাশেদুল হক
সহকারী অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ

এস, এম, আশরাফুল হাবিব
প্রভাষক
ব্যবস্থাপনা

আলমগীর হোসেন
প্রভাষক
ব্যবস্থাপনা

মোহা: আব্দুল রতিফ
সহযোগী অধ্যাপক (ইনসিটু)
রসায়ন

সৈয়দ মনিরুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক (সংযুক্ত)
রসায়ন

মো: নাহিদ রেজা
প্রভাষক
রসায়ন

নিগার ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক
পদার্থবিদ্যা

নজির আহমদ সিদ্দিক
সহকারী অধ্যাপক
গণিত

রিয়া রাণী শীল
প্রভাষক
গণিত

বিজয় কুমার ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক, (ইনসিটু)
প্রাণিবিদ্যা

মোছা: আউলিয়া খাতুন
প্রভাষক
প্রাণিবিদ্যা

গোলাম মহিউদ্দীন
প্রভাষক
উদ্ভিদবিদ্যা

মো: শহিদুল ইসলাম
গ্রন্থাগারিক

মো: আলমগীর হোসেন
শরীর চর্চা শিক্ষক

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

সরকারি কর্মচারী

মোছা: সালমা আক্তার
প্রধান সহকারী

মো: আজিমুল ইসলাম
অফিস সহকারী

মো: মুকুল হোসেন
হিসাব সহকারী

তরিকুল ইসলাম
ক্যাশিয়ার

মোছা: আফরোজা খানম
দক্ষ বেয়ারার

মো: ছমির উদ্দীন
অফিস সহায়ক

মো: ছানোয়ার খাঁন
অফিস সহায়ক

মো: আলাউদ্দিন
অফিস সহায়ক

মোছা: আছিয়া খাতুন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

বেসরকারি কর্মচারী

মো: আশরাফুল ইসলাম
ক্যাশ সরকার

মো: কলিমউদ্দীন
অফিস সহায়ক, রসায়ন

মো: মিনহাজ উদ্দীন
সেমিনার সহকারী, বাংলা

মেহেরুবা ডলি
সেমিনার সহাকরী, ইংরেজি

মো: শফিকুল ইসলাম
অফিস সহায়ক, অধ্যক্ষ চেম্বার

মো: আবুল কালাম আজাদ
সেমিনার সহকারী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মো: হাসেল খাঁন
সেমিনার সহকারী, অর্থনীতি

মো: মেহেদী হাসান
কম্পিউটার অপরেটর

মো: রাজু আহমেদ
অফিস সহায়ক

মো: জুয়েল রানা
নৈশ প্রহারী

মো: দবির হোসেন
নৈশ প্রহরী

মো: নজরুল ইসলাম
সেমিনার সহকারী, দর্শন

মো: সিরাজুল ইসলাম
সেমিনার সহকারী
ইস: ইতি: ও সংস্কৃতি

কিবরিয়া হোসেন
সেমিনার সহকারী
ব্যবস্থাপনা

এনামুল হক বাবলু
দিবা প্রহরী

মো: হাফিজুর রহমান
সেমিনার সহকারী
হিসাববিজ্ঞান

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ

বেসরকারি কর্মচারী

মোঃ হাবিবুর রহমান
অফিস সহায়ক, লাইব্রেরি

জাহিদুল ইসলাম
কম্পিউটার অপারেটর

মুকুল হোসেন
মালী

মোঃ শান্ত খান
দিবা প্রহরী

মোঃ রাজু আহমেদ
নৈশ প্রহরী

সোনিয়া খাতুন
দিবা প্রহরী, মহিলা হোস্টেল

মোঃ শক্তি
দিবা প্রহরী

মাওলানা আহমাদুল্লাহ
পেশ ইমাম
কলেজ মসজিদ

মোঃ ফিরোজ আলী
মুয়াজ্জিন
কলেজ মসজিদ

শ্রীমতি ননী বালা
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

শ্রীমতি সাবিত্রী বালা
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

মেহেরপুর সরকারি কলেজ

ম্যাগাজিন প্রকাশনা কমিটি-২০২৫

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর
অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

মোঃ খেজমত আলি মালিথ্যা
আহবায়ক

মঈনুল ইসলাম
সদস্য

মিলন মন্ডল
সদস্য

এস, এম, আশরাফুল হাবিব
সদস্য

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ
২০২৫-২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর
সভাপতি
শিক্ষক পরিষদ ও অধ্যক্ষ
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

মো: খেজমত আলি মালিথ্যা
সম্পাদক
শিক্ষক পরিষদ
সহযোগী অধ্যাপক (ইনসিটু), বাংলা
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

মিলন মন্ডল
সহ-সম্পাদক
শিক্ষক পরিষদ
প্রভাষক, ইংরেজি
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

মো: নাহিদ রেজা
কোষাধ্যক্ষ
শিক্ষক পরিষদ
প্রভাষক, রসায়ন
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

কলেজ এ্যালবাম

মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর
THINK BIG

একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ক
সচেতনতামূলক প্রচারণা

ঈদ পুনর্মিলনী

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষ (TSCR)
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর
রমজানুল মোবারক উপলক্ষে
অসহায় পরিবারের মাঝে
ইফতারী উপকরণ বিতরণ কর্মসূচী
আয়োজনে: রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা, মেহেরপুর

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষ (TSCR)
মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর

মেহেরপুর সরকারি কলেজ,